বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

মূল্য : ১৫ টাকা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্

ওঁ

ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

৫১তম বর্ষ ◆ দশম সংখ্যা ◆ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ [মে, ২০২৬]

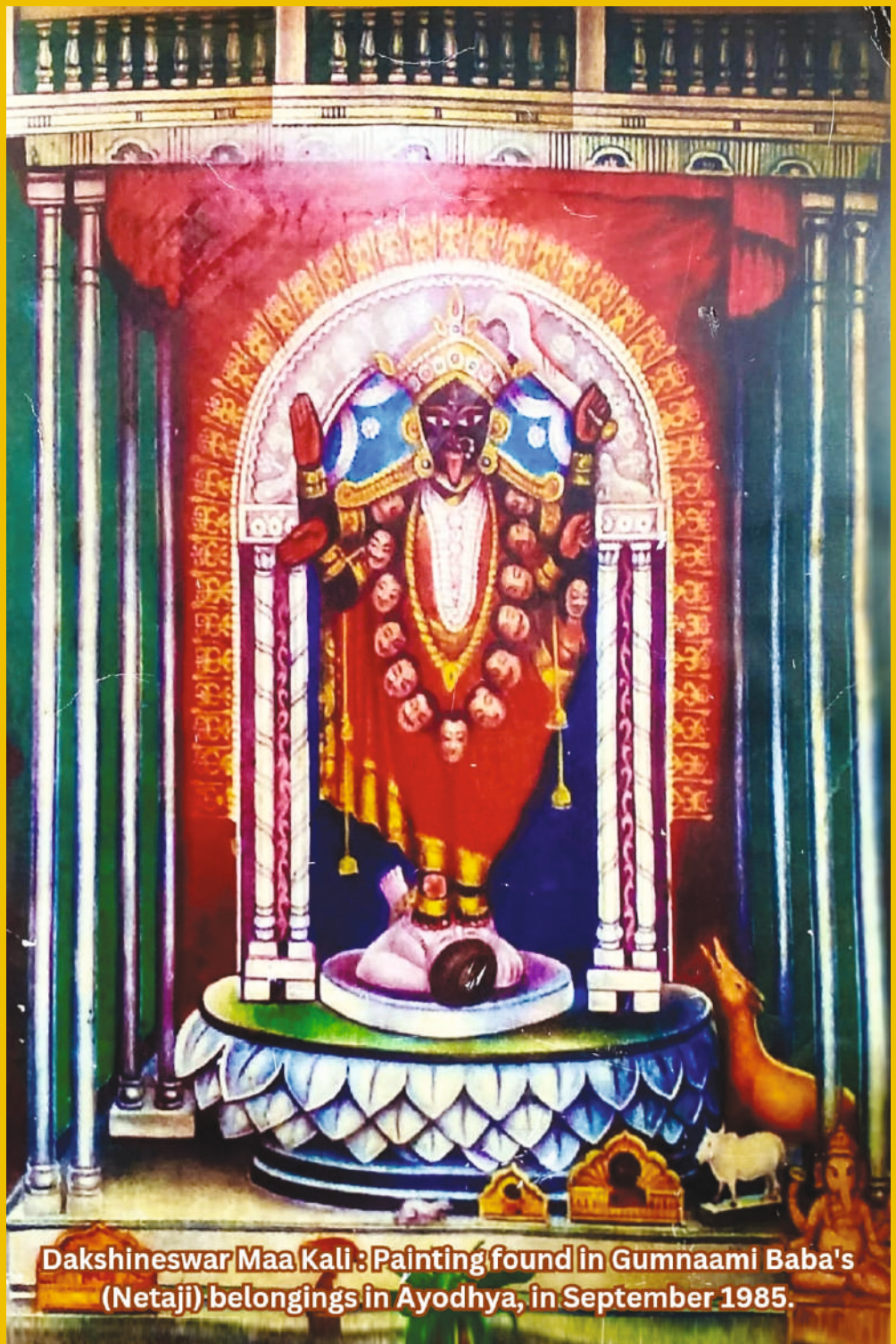

Dakshineswar Maa Kali : Painting found in Gumnaami Baba's (Netaji) belongings in Ayodhya, in September 1985.

প্রতিভা বিকাশ কেন্দ্র, ডেবরা

রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন, শ্যামবাজার, দক্ষিণবঙ্গ

TCS মহারাষ্ট্র নাসিকে হিন্দু মহিলা কর্মীদের উপর জিহাদীদের দ্বারা যৌন নির্যাতন, মানসিক হেনস্তা এবং ধর্মান্তরণ-এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ব্যারাকপুর জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

ভবানীপুরে ভোলাগিরি আশ্রমের সাধু সন্তদের উপর হামলার প্রতিবাদে বঙ্গীয় সন্ত সমাজের বিক্ষোভ মিছিল, দক্ষিণবঙ্গ

কল্যাণ বাণী

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে।। ১৮/২৬।।

'যে কর্তা আসক্তি থেকে মুক্ত, কর্তৃত্বাভিমানশূন্য, ধৈর্য ও উৎসাহযুক্ত, সাফল্য ও ব্যর্থতায় নির্বিকার, (তাঁকে) সাত্ত্বিক বলা হয়।'

সম্পাদকীয়...

উত্তরাখণ্ডের গঙ্গোত্রী থেকে পবিত্র গঙ্গা নদীর জন্ম হয়ে পশ্চিমবঙ্গের গঙ্গাসাগরে বিলীন হয়েছে। গঙ্গার এই যাত্রার পথ উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার রাজ্যের উপর দিয়ে গেছে, সেই সব রাজ্যে সনাতনীদের দ্বারা নির্বাচিত সরকার (বি.জে.পি) আছে, কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া। কিন্তু গত বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ মুসলিম তোষণকারী দলের সরকারকে উপড়ে দিয়ে সনাতনের ধ্বজা ধারক সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। বাস্তবে এই নির্বাচনে সাধারণ মানুষের মনে তৃণমূলকে হারানোর স্পৃহা এতটাই ছিল যে, ৯২ শতাংশের বেশী মানুষ তাদের মতামতকে ই.ভি.এম-এর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে। যেমন ২০১১ খ্রিস্টাব্দে সন্ত্রাসবাদী, মাওবাদী পন্থী বামফ্রন্ট সরকারের ৩৪ বছরের অপশাসনকে উপড়ানোর সময় দেখা গিয়েছিল। পশ্চিমবাংলাতে ভারতীয় জনতা পার্টির এই বিজয় কেবলমাত্র কোন এক রাজ্যের উপর রাজনৈতিক বিজয় ভাবলে ভুল হবে, বরং ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ রাজনৈতিক বিমর্ষকে পাল্টানোর মতন এক জনজাগরণ বলা উচিত। এই নির্বাচনে মানুষ অত্যাচারী দুর্নীতিগ্রস্ত, তোষণবাদী, অহংকারে মত্ত নেতাদের ঘরে ঢুকে হারিয়েছে, যেমনটা অপারেশন সিন্দুরের সময় আমরা দেখেছি পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকে আতঙ্কবাদীদের হারানোর সময় সেনাবাহিনীকে। যদি না কেন্দ্র সরকার এত বড় সংখ্যায় সুরক্ষা বাহিনী পাঠাত এবং সুরক্ষার বাতাবরণ নির্মাণ না করত, তাহলে কোন মতেই হত্যা এবং সন্ত্রাসবিহীন নির্বাচন সম্ভব হতো না—উক্ত মত সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে পাওয়া গেছে।

বাংলার ইতিহাস যতটা গৌরবশালী ছিল, ঠিক ততটাই গত ৫০ বছরে মানুষের উপর অত্যাচারের, বিড়ম্বনার ইতিহাস নির্মাণ হয়েছে—তা আমরা কম বেশি সকলেই জানি। বাংলাতে গণতন্ত্রকে বাঁচানোর দিশাতে নির্বাচন কমিশন এবং তার প্রধান জ্ঞানেশ কুমার এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শ্রীমনোজ আগারওয়াল যে ধরনের সাহসিক এবং ঐতিহাসিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা অত্যন্ত প্রশংসাযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ এস.আই.আর প্রক্রিয়া থেকে ৯১ লক্ষ মৃত ও অবৈধ ভোটারের নাম নির্বাচনের সূচি থেকে সরিয়ে স্বচ্ছ ও অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থা তারা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সহ আরও চারটি স্থানে এস.আই.আর হয়েছিল, কিন্তু একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে এই প্রক্রিয়াকে এত বেশি জটিল করে তোলা হয়েছিল, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এবং তার সরকার দ্বারা। এই বিষয়টি আমাদের সংঘীয় ব্যবস্থার প্রতি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর অনীহা এবং অবিশ্বাসকেই প্রকাশিত করে।

এই নির্বাচন কেবলমাত্র বি.জে.পি কিংবা টি.এম.সি-র প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল না। এটি ছিল বাংলার লুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি এবং আত্মাকে বাঁচানোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জনগণের সামনে একটা স্পষ্ট বার্তা ছিল, সনাতনী ভারতের সঙ্গে যাবেন, নাকি একটি সন্ত্রাসবাদি তোলাবাজি মহিলা বিদ্বেষী শাসনের সঙ্গে যাবেন? চৈতন্য মহাপ্রভু, রামকৃষ্ণ, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, ঋষি অরবিন্দ, সুভাষচন্দ্র বোস, শ্যামাপ্রসাদের কর্মভূমি ও পুণ্যভূমির প্রদেশ হচ্ছে এই বাংলা যাকে আগে বঙ্গদেশ বলা হত। বি.জে.পি এর আগেই অঙ্গদেশ অর্থাৎ বিহার, কলিঙ্গ দেশ অর্থাৎ ওড়িশাতে সনাতনী শাসন চালাচ্ছে। এইবার বাংলার মানুষ দুই হাত ভরে বি.জে.পি-কে আশীর্বাদ দিয়েছেন।

নারী নির্যাতন এবং আইন শৃঙ্খলার অবনতিতে মানুষ আস্থা হারিয়েছে মমতার প্রশাসনের। নিয়োগ দুর্নীতি, গরু ও কয়লা পাচার, রেশন কেলেঙ্কারি প্রভৃতি মমতা সরকারের ভাবমূর্তিকে নষ্ট করেছে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুব সাথী, ইমাম ভাতা, পুরোহিত ভাতার উর্ধে উঠে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তাদের রায়দান করেছেন। এই ফলাফল মূলত, ফিরাদ হাকিম হিন্দুদের দুর্ভাগা বলে অভিহিত করার, হিন্দুদের দাওয়াতে ইসলামের ছলে মুসলমানে ধর্মান্তরিত করার চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। কলকাতাকে মিনি পাকিস্তান বলার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদ প্রাক্তন টি.এম.সি বিধায়ক হুমায়ুনকে দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে অত্যাচারিত বাবরের নামে বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য উস্কানির বিরুদ্ধে। এই ফলাফল মাননীয়ার একটি কমিউনিটিকে দিয়ে হিন্দুধর্মের মানুষকে এক সেকেন্ড মেরে ফেলার হুমকি দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই ফলাফল অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী এবং রোহিঙ্গাদের পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকত্ব দিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে 'পশ্চিম

বাংলাদেশ' বানানোর চক্রান্তের বিরুদ্ধে জাগ্রত জন-জাগরণের। এই জয় আর.জি.করের অভয়া সহ বাংলার শত শত নির্যাতিত মা বোনের আর্ত চিৎকারের বহিঃপ্রকাশ।

হিন্দুত্বের এই জাগরণের জন্য ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ প্রায় ৮৫ বছর ধরে বাংলার মাটিতে সংকল্প, সিদ্ধি ও সাধনার সঙ্গে আর.এস.এস, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং তার সহযোগী সংগঠনগুলো নিরলসতার সঙ্গে কাজ করে চলেছে। তার ফলস্বরূপ আজ এই হিন্দুদের বিজয়। এই নির্বাচন আর পাঁচটি রাজ্যের মতো সাধারণ একটা নির্বাচন ছিল না। বাস্তবে এই নির্বাচন ছিল মহাভারতের কুরুক্ষেত্রের ধর্মযুদ্ধের মতো। বিগত ৪৯ বছর ধরে (৩৪ বছর সি.পি.এম এবং ১৫ বছর টি.এম.সি) হিন্দু বিদ্বেষী জেহাদি সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলো হিন্দুদের সম্মানসহ বাঁচা দুষ্কর করে তুলেছিল। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলমানরা ভারতবর্ষকে ভেঙে অখণ্ড বাংলাকে যখন ইসলামিক দেশ বানাতে চেয়েছিল, সেদিন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী পশ্চিমবঙ্গ নির্মাণের মাধ্যমে হিন্দু বাঙালিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাদের আত্মপরিচয়। কিন্তু গত ৫০ বছর হিন্দু বাঙালির বাসভূমি পশ্চিমবঙ্গ থেকে হিন্দুত্বকে মুছে ফেলার জন্য অনেক রকম চেষ্টা করেছিল ওরা। তৃণমূলীরা তো কৃত্তিবাসী রামায়ণে বর্ণিত ভগবান রামচন্দ্রের জয়ঘোষ 'জয় শ্রীরাম'-কে গালাগালি বলে অভিহিত করেছিল। বাংলার মাটিতে লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ চরমে পৌঁছে গিয়েছিল। সন্ত্রাসবাদীদের আতুরঘর হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই নেতাজির কর্মভূমি পশ্চিমবঙ্গ। কেরালাতে যেমন বামপন্থীদের দ্বারা আর.এস.এস এবং বি.জে.পি-র কার্যকর্তাদের উপর হামলা করা হতো, হত্যা করা হতো, ঠিক সেই ভাবেই শাসকদের গুন্ডারা আর.এস.এস এবং বি.জে.পি-র কার্যকর্তাদের হত্যা, ধর্ষণ, বাড়িঘর পোড়ানোর কাজ করত। ২০২৬-এ তাদের পাপের ঘড়া পূর্ণ হয়েছে। তাই লক্ষণ সেনের শাসনের শেষে ৮২০ বছর পর খন্ডিত বাংলায় পুনরায় হিন্দু সাম্রাজ্যের আদর্শে রামরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আত্মা যেখানেই থাকুক না কেন, তিনি আজ তৃপ্তি অনুভব করে আশীর্বাদ প্রদান করবেন।

অন্যদিকে অসমে তৃতীয়বার হেমন্ত বিশ্বশর্মার নেতৃত্বে সরকার গড়েছে। এই নির্বাচনে বি.জে.পি তথা এন.ডি.এ জোট অনুপ্রবেশ রোধ এবং বিদেশীদের পুশব্যাকের উপর জোর দিয়েছিল। অসমের আত্মপরিচয় রক্ষার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেমি কন্ডাক্টর সহ অন্যান্য শিল্পে মোটা অংকের বিনিয়োগ এনেছে হেমন্ত বিশ্বশর্মার সরকার। এই সবের সুফল পেয়েছে বি.জে.পি তথা এন.ডি.এ জোট। বাংলা, বিহার, ওড়িশা, আসাম, ত্রিপুরা সহ উত্তর পূর্বাঞ্চল আজ গেরুয়াময় হয়েছে। তামিলনাড়ুতে ডি.এম.কে বনাম এ.ডি.এম.কে লড়াইকে পিছনে ফেলে নতুন শক্তিরূপে টি.ভি.কে-এর উদয় হয়েছে। সনাতনীদের এইডস, টিবি, ম্যালেরিয়া বলে অপমানিত করার ফল দিয়েছে সেখানকার জনগণ। এমনকি বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী তথা ডি.এম.কে প্রধান এম.কে স্তালীন কোলাথুর কেন্দ্রে পরাস্ত হয়েছেন, যেমনটা পশ্চিমবঙ্গে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার নিজের কেন্দ্র ভবানীপুরে হয়েছেন। কেরলমে সরকার করেছে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ.ডি.এফ। অর্থাৎ বামপন্থীরা আজ ভারতবর্ষের শাসনের নকশা থেকে বিলুপ্ত হয়েছে। পদুচেরিতে এবারও এন.ডি.এ সরকার গড়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং গৃহমন্ত্রী অমিত শাহকে এই ঐতিহাসিক গৈরিক বিজয়ের মুখ্য শিল্পকার বলা যেতে পারে। এর সঙ্গে সঙ্গে অবশ্যই উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, অসমের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা, লোকপ্রিয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং দিলীপ ঘোষ, প্রান্ত সভাপতি শমিক ভট্টাচার্য তথা অন্যান্য কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতাদের দিতেই হবে। পাশাপাশি অসংখ্য সনাতন হিন্দু স্বয়ংসেবক, দুর্গাবাহিনী, বজরং দলের সদস্যদের এই জয়ের অংশীদারি দিতেই হবে। বিশ্ব হিন্দু বার্তা, স্বস্তিকা তথা অন্যান্য পত্র-পত্রিকার ও হিন্দুদের ১০০% ভোট দানের জন্য উৎসাহ প্রদানের ভূমিকা আছে। বৈচারিক এবং সাংস্কৃতিক জাগরণ বাস্তবে পত্র-পত্রিকা, সোশ্যাল মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রখর ভূমিকা এই নির্বাচনে আরো একবার প্রমাণিত হয়েছে। ■

আগামী দুই সংখ্যার বিষয়

আষাঢ় ১৪৩৩ (জুন, ২০২৬) : গঙ্গা দশহরা, স্নানযাত্রা, লোকনাথ বাবার পুজো তিথি, গুরু গোবিন্দ সিং জয়ন্তী, শ্যামাপ্রসাদ জয়ন্তী, সন্ত রবিদাস জয়ন্তী, বিবিধ।

শ্রাবণ ১৪৩৩ (জুলাই, ২০২৬) : শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী জন্মদিবস, রথপূর্ণিমা, গুরুপূর্ণিমা, স্বামী তুলসী জয়ন্তী, করপাত্রীজি মহারাজ জয়ন্তী, পূর্ণযাত্রা বিবিধ।

বিশ্ব হিন্দু বার্তা

কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্যম্ ॐ ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র

কার্যালয় : ৩৩, ভূপেন বোস এভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা-৭০০০০৪

প্রচার কার্যালয় : ১৭বি, নলিন সরকার স্ট্রিট, খান্না মোড়, কলকাতা-৪

দূরভাষ : ২৫৫৫-৩৫৮৯, দিলীপকুমার ঝাঁওর : ৯৯৩৩১৫০০৩৭

SCAN & PAY USING ANY BHIM UPI APP

9038149815m@pnb

MERCHANT: VISHVA HINDU VARTA

৫১তম বর্ষ * দশম সংখ্যা * জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ (মে, ২০২৬)

'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র পরিচালন মণ্ডলী

● সভাপতি
শ্রীদিলীপকুমার ঝাঁওর

● সহ-সভাপতি
শ্রীচন্দ্রনাথ দাস (সম্পাদক, দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীতরুণকুমার লায়েক (সম্পাদক, মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীলক্ষ্মণ বনসল (সম্পাদক, উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশঙ্কর রায় (সম্পাদক, ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সম্পাদক
অধ্যাপক ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

● সহ-সম্পাদক
শ্রীসৌগত বসু, সুশ্রী পারমিতা পাল

● প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীজয়ন্ত ভৌমিক

● সহ-প্রচার প্রসার প্রমুখ
শ্রীচন্দন গুপ্তা (দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীবিপ্লব চ্যাটার্জি (মধ্যবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীশ্রীকান্ত ঘোষ (উত্তরবঙ্গ প্রান্ত)
শ্রীঅমলকান্তি দাশ (ত্রিপুরা প্রান্ত)

● সদস্য : শ্রীপীতারুণ মুখোপাধ্যায়, শ্রীদীপক চৌধুরী, শ্রীঅর্ণব দে, শ্রীশুভজিৎ দাস

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয়	৩
'যত মত তত পথ' হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি—স্বামী মৃগানন্দ	৬
বেদের দৃষ্টিতে একেশ্বরবাদ—প্রোজ্জ্বল মণ্ডল	৯
হনুমানজী : বর্ণ-ধাতু থেকে অর্থতত্ত্বাদির সাম্প্রতিক প্রেক্ষিত-চারণা—ড. শ্যামলচন্দ্র দাস	১১
ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ও মহা নিষ্ক্রমণ —গোপাল চক্রবর্তী	১৫
শ্রীমদ্ভাগবত গীতার প্রাসঙ্গিকতা : হিন্দুস্তানের খ্রিস্টায়ন ও ইসলামায়নের অতীত ও বর্তমান—ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়	১৭
রিনিউয়েবল এনার্জি—বিকল্প উর্জা নীতিতে এগিয়ে ভারত —দিলীপ কুমার ঝাঁওর	২০
বীর শিরোমণি মহারানা প্রতাপ—রাজকুমারী মাহেশ্বরী	২১
মহিলা শক্তির নারীবন্দন বিল পিছিয়ে দিল ওঁরা —ড. জয়ন্ত বিশ্বাস	২৩
সনাতন ধর্মকে বিনাশ করার জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান থাকা দরকার—আদিত্য দেব	২৫
দেশের প্রতি আস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক—পারমিতা পাল	২৭
সনাতনীদের সাইক্লোনে মমতা কুপোকাত —ড. রামানুজ গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ	২৯
সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবন : আধুনিক ভারতকে পুনঃসংযুক্ত, উদ্ভাবনী ও অনুপ্রাণিত করার একটি পথ —বরিষণ চট্টোপাধ্যায়	৩১
মোহিনী একাদশী—অর্পিতা বোস	৩৩
রবীন্দ্র সাহিত্যে ভগবান বুদ্ধ—রবিব্রত ঘোষ	৩৪
ভারতের জন্য বিপদসঙ্কেত—সুদীপনারায়ণ ঘোষ	৩৭
পুনর্জাগ্রত বঙ্গাল : নেতাজী কী রাষ্ট্রভক্তি और সনাতন কী দিশা में নया অধ্যায়—প্রশান্ত সিংঘানিয়া	৪০
শ্রীরামজী কো প্রিয় লগনেবালে শ্রেষ্ঠ নৌ নবক —অরুণ চুড়ীবাল	৪২

প্রতি সংখ্যার মূল্য	বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা	দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক (১৫ বছর)	ডাক মাশুল
১৫ টাকা	১৮০ টাকা	২৫০০ টাকা	নিঃশুল্ক

বিশেষ ডাক ব্যবস্থায় 'বিশ্ব হিন্দু বার্তা'র গ্রাহক শুল্ক বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বিশ্ব হিন্দু বার্তার গ্রাহক হওয়ার জন্য নিচের দেওয়া ব্যাঙ্ক তথ্যে শুল্ক পাঠান এবং নিজের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বর ও হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর এই নম্বরে জানান :
জয়ন্ত ভৌমিক : ৮৯৬১৭১২১০৬

VISHVA HINDU VARTA
Punjab National Bank A/c. No. : 1183010102690
IFSC Code : PUNB0118320, MICR : 700024325
Shyambazar Market Evening Branch

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

Back Cover Page	Rs. 50,000/-
Inside Front or Back Cover Page	Rs. 30,000/-
Inside Full Colour Page	Rs. 20,000/-
Colour Half Page	Rs. 10,000/-
Colour Quater Page	Rs. 5,000/-

চিঠিপত্র বিভাগ
পত্রিকার লেখা সংক্রান্ত কোনও জিজ্ঞাসা থাকলে এই নম্বরে হোয়াটস্যাপ করুন
৭৮৭২৪৬১৬১৬

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
E-mail : advertisement.vishvahinduvarta@gmail.com
প্রকাশন বিভাগ : বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, দক্ষিণবঙ্গ
মুদ্রণ : আদিত্য গ্রাফিক্স অ্যান্ড প্রিন্টিং
RNI No. : 30136/1976

● লেখকদের প্রতি

১। প্রতি ইংরেজি মাসের ২৫ তারিখের মধ্যে লেখা পাঠান।
২। পরিষদ সম্পর্কে বার্তা ছবি ও প্রতিবেদন **e-mail** কিংবা **WhatsApp**-এর মাধ্যমে পাঠাতে পারেন।
৩। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখিত তথ্যের দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক বা প্রাবন্ধিকের, কর্তৃপক্ষের নয়।

‘যত মত তত পথ’ হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি

বৈশাখ সংখ্যার পর....

স্বামী মৃগানন্দ

(পুনর্মুদ্রণ)

সেখানে বিবর্ত কোথায়, অজাতই বা কোথায়? বিবর্ত, অজাত, পরিণাম তাঁতেই হচ্ছে। তিনি মাত্র সত্য। আবার তা থেকে যে জীব জগৎ হচ্ছে, তাও সত্য যদি তাঁকে না ভোলা যায়। তাঁকে ভুলে নামরূপ দেখলেই মিথ্যা হয়ে গেল। কেন? না, তারা থাকে না। কিন্তু যদি তাঁকে মনে থাকে, তবে বুঝতে পারি মাজেরই খোল, খোলেরই মাজ। ‘ময়া ততমিদং সর্বং’, ‘ময়ি সর্বমিদং প্রোতং’ ইত্যাদি তখন যেন বোঝা যায়। আসল কথা তাঁকে দেখতে হবে। তাঁকে দেখলে আর কিছুই থাকে না। সব তিনি ময় বোধ হয়ে যায়। তাঁকে দেখবার আগে অবধি যত গোল, যত বাদ-বিবাদ। তাঁকে দেখলে সব গোল মেটে। তাঁকে জানলেই নিরাবিল শান্তি।

ঠাকুরের মত অতএব এইরূপ : যে কোন উপায়ে, যা হোক করে তাঁকে পাইতে হইবে। ‘‘অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে কর’’—ইহার অর্থ একবার যদি তাঁকে পাও, তবে তোমার রুচি অনুসারে যে কোন মত পোষণে আসে যায় না। তাঁকে জানলেই মুক্তি অবশ্যম্ভাবী। (শ্রীরামকৃষ্ণকে যেরূপ দেখিয়াছি—সম্পাদক, স্বামী চেতনানন্দ, পৃঃ ১৮৪-৮৫)

শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মসমন্বয়-কেন্দ্রিক বাণীর মূল তাৎপর্য সমভাবাপন্ন সকল ধর্মকে ঈশ্বরলাভের একটি পথ বলে সুবিজ্ঞাত করা, যাতে প্রত্যেক ঈশ্বরানুসন্ধিৎসু মানুষ তার নিজ নিজ ধর্মপথকে নিষ্ঠার সঙ্গে আঁকড়ে ধরে চলবে। স্বধর্মনিষ্ঠা ছাড়া ঈশ্বরলাভ হয় না। এই স্বধর্ম নিষ্ঠাকে সুদৃঢ় করার জন্যই মা ভবতারিণীর নির্দেশে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের এত ভাবের সাধনা এবং ঐ অপূর্ব ঘোষণা—যত মত তত পথ। এই মতগুলো কিন্তু ঈশ্বরলাভের উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক, দেহসুখলাভের উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক নয়—এ কথা বিশেষভাবে মনে রাখা দরকার।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণীর মুখ্য উদ্দেশ্য হিন্দুদের মধ্যে স্বধর্মনিষ্ঠার যথার্থ প্রতিষ্ঠা এবং হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে অযথা বিভেদের দেওয়ালগুলোকে ভেঙে পারস্পরিক শ্রদ্ধার উন্মেষ ঘটানো এবং ঐক্যসূত্রের প্রতিষ্ঠা করা। কথামৃতের বহুস্থলে এই কথাই শ্রীঠাকুর বহুভাবে এবং অতি স্পষ্টভাবে বলেছেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলরামের পিতা প্রভৃতি ভক্তদের বলছেন—‘‘বৈষ্ণবদের একটি গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই, —ভক্তদের সব কথা আছে। তবে একঘেয়ে। এক জায়গায় ভগবতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে।’’

‘‘আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক সুখ্যাতি করে সেজবাবুর কাছে আনলুম। সেজবাবু খুব যত্ন খাতির করলে। রূপার বাসন বার করে জল খাওয়ানো পর্যন্ত। তারপর সেজবাবুর সামনে বলে কি ‘‘আমাদের কেশব মন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না! সেজবাবু শাক্ত, ভগবতীর উপাসক। মুখ রাঙা হয়ে উঠলো। আমি আবার বৈষ্ণবচরণের গা টিপি।!’’

‘‘শ্রীমদভাগবত—তাতেও নাকি ঐ রকম কথা আছে, ‘কেশবমন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা!’ সব মতের লোকেরা আপনার মতটাই বড় করে গেছে।’’

‘‘শাক্তরাও বৈষ্ণবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। শ্রীকৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন। শাক্তরা বলে, ‘তাতো বটেই, মা রাজরাজেশ্বরী—তিনি কি আপনি এসে পার করবেন? ঐ কৃষ্ণকেই রেখে দিয়েছেন পার করবার জন্য।’’

‘‘নিজের নিজের মত লয়ে আবার অহংকার কত! ওদেশে, শ্যামবাজার এই সব জায়গায়, তাঁতিরা আছে। অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা। বলে, ইনি কোন্ বিষ্ণু মানেন! পাতা বিষ্ণু। (অর্থাৎ যিনি পালন করেন!) ও আমরা ছুঁই না! কোন্ শিব! আমরা আত্মারাম শিব, আত্মারামেশ্বর শিব মানি। এদিকে তাঁত বোনে, আবার এই সব লম্বা লম্বা কথা।’’

‘‘রতির মা রাণী কাত্যায়নীর মো-সাহেব; বৈষ্ণব-চরণের দলের লোক। গোঁড়া বৈষ্ণবী। এখানে খুব আসা যাওয়া করতো। ভক্তি দ্যাখে কে! যাই আমায় দেখলে মা কালীর প্রসাদ খেতে, অমনি পালালো!’’

‘‘যে সমন্বয় করছে, সেই-ই লোক। অনেকেই একঘেয়ে। আমি কিন্তু হিন্দু ঐক্যের ভিত্তি দেখি সব এক। শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত মত সবই সেই এককে লয়ে। যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার, তাঁরই নানা রূপ।’’

‘‘নির্গুণ মেরা বাপ সগুণ মাহতারী
কাকো নিন্দো কাকো বন্দো দোনো পল্লা ভারী।’’

''বেদে যাঁর কথা আছে, তন্ত্রে তাঁরই কথা, পুরাণেও তাঁরই কথা। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা।''

বেদে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। তন্ত্রে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দ শিবঃ—শিবঃ কেবলঃ—কেবলঃ শিবঃ। পুরাণে বলেছে, ও সচ্চিদানন্দঃ কৃষ্ণঃ। সেই এক সচ্চিদানন্দের কথাই বেদ পুরাণ তন্ত্রে আছে। আর বৈষ্ণব শাস্ত্রেও আছে কৃষ্ণই কালী হয়েছিলেন।''

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন শ্রীরাধিকা গোস্বামীকে গৌরগুণকীর্তন শোনালেন। গান শেষে বললেন—''এ তো আপনাদের (বৈষ্ণবদের) হল। আর যদি কেউ শাক্ত, কি ঘোষপাড়ার মত আসে, তখন কি বলবো? তাই এখানে সব ভাবই আছে—এখানে সব রকম লোক আসবে বলে; বৈষ্ণব, শাক্ত, কর্তাভজা, বেদান্তবাদী, আবার ইদানীং ব্রহ্মজ্ঞানী। তাঁরই ইচ্ছায় নানা ধর্ম, নানা মত হয়েছে।''

''তবে তিনি যার যা পেটে সয় তাকে সেইটি দিয়েছেন। মা সকলকে মাছের পোলোওয়া দেন না। সকলের পেটে সয় না। তাই কাউকে মাছের ঝোল করে দেন। যার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সে সেই ভাবটি নিয়ে থাকে।''

''বারোয়াড়ীতে নানা মূর্তি করে, আর নানা মতের লোক যায়। রাধাকৃষ্ণ, হরপার্বতী, সীতা-রাম, ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি রয়েছে আর প্রত্যেক মূর্তির কাছে লোকের ভিড় হয়েছে। যারা বৈষ্ণব তারা বেশি যত মত তত রাধা-কৃষ্ণের কাছে দাঁড়িয়ে দেখছে। যারা শাক্ত তারা হর-পার্বতীর কাছে যারা রামভক্ত তারা সীতা-রাম মূর্তির কাছে।'' আর এক জায়গায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলছেন—''দেখছো কত রকম মত। মত, পথ। অনন্ত মত অনন্ত পথ।''

ভক্ত জিজ্ঞাসা করলেন—''এখন উপায়!''

শ্রীঠাকুর বললেন—''একটা জোর করে ধরতে হয়। ছাদে যেতে গেলে পাকা সিঁড়িতে উঠা যায়; একখানা মইয়ে উঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে উঠা যায়; একগাছা দড়ি, একগাছা বাঁশ দিয়ে, উঠা যায়। কিন্তু এতে খানিকটা পা, ওতে খানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরতে হয়। ঈশ্বরলাভ করতে হলে, একটা পথ জোর করে ধরে যেতে হয়।''

''আর সব মতকে এক একটি পথ বলে জানবে। আমার ঠিক পথ আর সকলের মিথ্যা, এরূপ বোধ না হয়। বিদ্বেষভাব না হয়।''

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা এবং বাণীর মধ্যে লক্ষ করার কথা এই যে তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন হিন্দুদের বিভিন্ন মতের মধ্যে ঝগড়াটা অকারণ। এই ভিত্তিহীন অমূলক ঝগড়া আসলে হয় অজ্ঞানপ্রসূত, নয় অহংকারপ্রসূত। নিজের মতকে বড় করতে গিয়ে অপরকে ছোট করার পেছনে অন্য কোনও যুক্তি নেই। আমার সাধনপথ ভাল, একথা বেশ। কিন্তু তারই পাশাপাশি একথা বলার কি যুক্তি আছে যে, অপরের সাধনপথ মন্দ। আত্যন্তিকে সব আধ্যাত্মিক মার্গই সেই সচ্চিদানন্দকে লাভ করার পথ। সচ্চিদানন্দ অভিমুখী সব পথ সত্য, যে নামেই তাকে খ্যাত করা হোক না কেন। আর সেই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে কখনই কোনও একটি রূপে বা ভাবে আবদ্ধ করে রাখা যায় না। তিনি যেমন রাম কিংবা কৃষ্ণ চৈতন্য হতে বা পারেন, তেমনি পারেন শিব কিংবা দুর্গা কিংবা কালী হতে। তিনিই তো সব, আর সবেতেই তো তিনি।

শ্রীরামকৃষ্ণের মতে, মতুয়ার বুদ্ধি ভাল নয়। মতুয়ার বুদ্ধি পরিহারপূর্বক নিজের মতপথে নিষ্ঠা এবং অপরের মতপথে শ্রদ্ধার উপদেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁরই কথায় একটিতে গভীর ভালবাসার নাম নিষ্ঠা। ভগবান এই সব বৈচিত্র্য তৈরি করেছেন রুচি ভেদের জন্য, সংস্কার ভেদের জন্য, আধার ভেদের জন্য। আধার এবং অধিকারী সাপেক্ষ ধর্মমার্গই হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব। ঠাকুর বলছেন, এক মায়ের অনেক সন্তান। যার যা পেটে সয় মা তাকে সেইরকমই রান্না করে দেয়। সবারই পেটে এক খাবার সয় না। বিবেকানন্দ এই কথারই প্রতিধ্বনি করে খ্রিষ্টানদের উদ্দেশ্যে বলেছেন—সবারই জন্য এক মাপের জামা তৈরি করে রেখে দিলে সবারই তা গায়ে নাও লাগতে পারে। কেউ মোটা, কেউ রোগা, কেউ লম্বা, কেউ বেঁটে। তাই যার যা মাপ তার গায়ের মতো জামা দেওয়াই স্বাভাবিক যুক্তি। এটাই হিন্দুধর্মের বিশেষত্ব।

পাশাপাশি স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দুসমাজকে বিশেষভাবে সচেতন করে বলছেন যে, ''কোনো লোক হিন্দুসমাজ ত্যাগ করিলে সমাজে শুধু যে একটি লোক কম পড়ে তাহা নয়, একটি করিয়া শত্রুবৃদ্ধি হয়। ...যদি তোমরা আসিতে না দিতে, তবে কি জড়বাদ, মুসলমান ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম, পৃথিবীর অন্য কোনও মতবাদ—কিছুই কি স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইতো?... মুলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশি

হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোন প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না। হিন্দু জাতির লোপের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের শত দোষ সত্ত্বেও পৃথিবীর সম্মুখে তাহাদের শত শত বিকৃত চিত্র উপস্থাপিত হইলেও, এখনও তাহারা যে-সকল মহৎ ভাবের প্রতিনিধিরূপে বর্তমান, সেগুলিও লুপ্ত হইবে। আর হিন্দুদের লোপের সঙ্গে সঙ্গে সকল অধ্যাত্মজ্ঞানের চূড়ামণি অপূর্ব অদ্বৈততত্ত্বও বিলুপ্ত হইবে। এতএব ওঠ, জাগো-পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত কর।" বিবেকানন্দের এই নির্দেশ হিন্দুদের নিজস্ব স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যকে নিষ্ঠার সঙ্গে ধরে রাখার নির্দেশ। সব মত পথ যদি একই হতো তাহলে এই বাণীর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকতো না।

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা ও বাণীর মূল তাৎপর্য এবং সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্যই হচ্ছে—হিন্দুদের স্বধর্মনিষ্ঠায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। এই স্বধর্মনিষ্ঠায় সুপ্রতিষ্ঠিত না হলে অর্থাৎ একটা পথ ধরে একটানা না গেলে গন্তব্যে পৌঁছানো যায় না। তাই তিনি ভগবৎপথের বহুভাবের পথিককে নির্দেশ দিলেন, যে কোনও একটি পথ ধরে এগিয়ে যাও কারণ, সব মত সব মার্গই এক একটি পথ। অতএব এটাও পাশাপাশি বলে দিলেন—অপরে যে পথ দিয়ে যাচ্ছে যাক্, তাকেও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখবে, তাকে খারাপ বা ভুল বলার কোনও ঔচিত্য নেই। এটাই নিষ্ঠার সঙ্গে উদারতার সমন্বয়।

হিন্দুদের ধর্মদর্শনে আছে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই চতুরাশ্রমের মধ্য দিয়ে সুবিন্যস্ত জীবনযাপন-পূর্বক ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে লাভ করার কথা। মোক্ষ বা ঈশ্বরপ্রাপ্তি জীবনের চরম উদ্দেশ্যের সিদ্ধি। হিন্দুধর্মের বাইরে যে দুটি মতের সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণদেব করেছেন, সে দুটি মতে এরকম কোন জীবনদর্শন নেই, যার চরম ফল ঈশ্বরলাভ বা ব্রহ্মোপলব্ধি। হিন্দুদের মতে তো—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মৈব ভবতি। ভগবানকে লাভ করে মানুষ ভগবান হয়ে যায়। হিন্দুদের অবতারও অসংখ্য। এসব ব্যাপার ও দুটি মতে নেই।

তাই আগের আলোচনায় আমরা দেখেছি—যে দুটি বিজাতীয় মতের তথাকথিত সাধনা শ্রীরামকৃষ্ণদেব করেছেন, তাঁর সে সাধনার মূল ভাবটি কিন্তু হিন্দুভাব, উদ্দেশ্য—ভগবানকে পাওয়া, চিন্ময়ী জগন্মাতাকে পাওয়া, ব্রহ্ম বস্তুকে লাভ করা। অতএব ঐ দুই বিজাতীয় মতের নাম বজায় রেখেও কিভাবে আসল বস্তুটুকু গ্রহণ করতে হয়, সেটাই তিনি দেখিয়েছেন। শিশুর খেয়ালে বালকভাবে অনুষ্ঠিত বিজাতীয় মতের অতি গৌণ ও নগণ্যপ্রায় একটি সাধনার অংশকে বিরাট করে ফলাও করে দেখানোর কোনও প্রয়োজনও নেই, কোন যুক্তিও নেই। মুসলমান বা খ্রিষ্টানরা শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রফেট, রসুল, ঈশ্বরপুত্র কিংবা স্বয়ং ঈশ্বর বলে কোনও প্রকারেই মানেন না, মানতে পারেন না। সেক্ষেত্রে ওপরপড়া হয়ে একতরফা হিন্দু-মুসলমান-খ্রিষ্টান-ঐক্য বিধাতা সর্বধর্মসন্বয়কারীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রজেক্ট করার প্রচেষ্টা কিছুটা হাস্যকর, এমনকি আত্মমর্যাদা-হানিকর বলেই মনে হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নির্দেশকে ধরতে হবে প্রজ্ঞার দৃষ্টিতে, দেশকালের পটভূমিতে। বুঝতে হবে তাঁর সাধনা ও বাণীর মূল তাৎপর্য। হিন্দুজাতির ম্রিয়মাণ স্বধর্মনিষ্ঠা, লুপ্তপ্রায় আত্মমর্যাদাবোধ ও হিন্দুত্বের গৌরববোধকে ফিরিয়ে আনার জন্য করতে হবে তাঁর বাণীর রূপায়ণ।

মারওয়াড়ী ভক্তদের ভক্তি দেখে বলেছেন— ''খোট্টাদের কি ভক্তি দেখেছ, প্রসঙ্গতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের একটি বাণী বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি যথার্থ হিন্দুভাব। এই সনাতন ধর্ম...হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম। ইদানীং যে সব ধর্ম দেখছ এসব তাঁরই ইচ্ছাতে হবে যাবে, থাকবে না। তাই আমি বলি, ইদানীং যে সব ভক্ত তাদেরও চরণেভ্যো নমঃ। হিন্দুধর্ম বরাবর আছে, বরাবর থাকবে।"

অতএব শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী 'যত মত তত পথ'-এর অপব্যাখ্যা করে হিন্দুদের স্বধর্ম নিষ্ঠা থেকে সরে যাবার যে প্রবণতা দেখা যাচ্ছে, সেটা আত্মহননেরই পথ। সেটাকে রোধ করা আবশ্যক। তাই মনে হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের মহাবাণীর প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করে সমগ্র হিন্দুসমাজকে সম্পাদন করতে হবে দুটি মুখ্য কর্তব্য। প্রথমতঃ নিজ নিজ ধর্মাচরণে এবং জীবনচর্যার সর্বক্ষেত্রে ফিরিয়ে আনতে হবে দৃঢ় স্বধর্ম-নিষ্ঠা। দ্বিতীয়তঃ, পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রীতির মাধ্যমে নির্মাণ করতে হবে হিন্দুত্বের সামগ্রিক সত্তার ঐক্যপ্রতিমা। সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বহু ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত সেই মহামহিম ঐক্যপ্রতিমার পাদপদ্মে কালে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করবে সমগ্র পৃথিবী। শ্রীঠাকুর কৃপা করে আমাদের সেই শক্তি প্রদান করুন—এই প্রার্থনা। ■

(সমাপ্ত)

বেদের দৃষ্টিতে একেশ্বরবাদ

প্রোজ্জ্বল মণ্ডল

একের মধ্যে বহুর অভিব্যক্তি

বৈদিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে একেশ্বরবাদের চিরন্তন সত্য রয়েছে, যা একই সঙ্গে এক এবং বহুর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। বেদে দেবতাদের বহুত্ব দেখে অনেকে বিভ্রান্ত হন। কিন্তু এই বহুত্ব আসলে একক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন প্রকাশ—তাঁর মহিমা, গুণ এবং কার্যের বিভিন্ন রূপ। এক এবং বহু কখনো পরস্পরবিরোধী নয়; বরং বহু একেরই বিস্তার। ঋষিরা এই সত্যকে উন্মোচিত করেছেন মন্ত্রের মাধ্যমে, যেখানে 'একো দেবঃ' এবং 'একং সৎ' শব্দগুলো স্পষ্ট সংকেত হিসেবে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই প্রবন্ধে আমরা বেদের শ্লোকগুলোর আলোকে দেখব কিভাবে একক সত্তা সৃষ্টির প্রতিটি কোণে বিরাজমান, এবং কেন সনাতন ধর্ম একেশ্বরবাদের অটল ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে।

এক সত্তার বহু নাম : ঋষির দর্শন

বৈদিক ঋষিরা একক সত্তাকে বহু নামে স্তুতি করেছেন, কারণ তিনি সকল গুণের সমাহার। ঋগ্বেদের (১/১৬৪/৪৬) বিখ্যাত মন্ত্রে দীর্ঘতমা ঋষি বলেছেন :

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমাহুরথো দিব্য স সপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্ত্যগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।।

এখানে ঋষি স্পষ্ট করে বলছেন যে, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, দ্যুলোকের সুপার্ণ—সবাই এক সৎ সত্তার প্রকাশ। জ্ঞানীরা এক সত্যকে বহু নামে অভিহিত করেন, কিন্তু তার মূল রূপ অপরিবর্তিত। এই মন্ত্র একেশ্বরবাদের সারাংশ : বহু দেবতা এক ঈশ্বরেরই বিভূতি। বিশ্বের অনন্ত কার্যপ্রবাহকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার নামে স্তুতি করা হয়, কিন্তু সেই কার্যের উৎস একই—একক ঈশ্বরের ঐশ্বরিক শক্তি। এক একের মধ্যে বহু হয়ে উদ্ভাসিত হন, আবার বহুর মধ্যে একই অটলভাবে বিদ্যমান।

একইভাবে, ঋগ্বেদ (২/১২৯/২)-এ প্রজাপতি ঋষি বিশ্বসৃষ্টির পূর্ববর্তী অবস্থা বর্ণনা করেছেন :

ন মৃত্যু বাসীদমৃতং ন তর্হি ন বাত্র্যা অহ্ন আসীৎপ্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তসমাদ্ধান ন্ন পরঃ কিং চ নাস।।

সৃষ্টির আগে কোন মৃত্যু বা অমরত্ব ছিল না, রাত্রি- দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল 'তদেকং'—একমাত্র সেই এক সত্তা, যা বায়ুর সাহায্য ছাড়াই আত্মশক্তিতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসহীন জীবিত ছিল। তিনি ছাড়া আর কিছুই ছিল না। প্রকাশিত অবস্থায় তিনি 'সৎ', অপ্রকাশিত অবস্থায় 'তৎ'। সকল দেবতা এই এক সত্তারই প্রকাশ।

একত্বের দ্বন্দ্বহীনতা : বহুর মধ্যে এক

বৈদিক চিন্তায় এক এবং বহুর মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। এক একের ইচ্ছায় বহু হয়ে উদ্ভূত হন, আবার বহুর প্রতিটি কণায় একই অনুসৃত। ঋষিরা বলেছেন 'একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি', 'একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা', এবং কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় কঠ উপনিষদ (২/২/১২)-এ 'একং রূপং বহুদা যঃ করোতি'। একমাত্র 'একমেবাদ্বিতীয়ম্', আবার 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'। এই দ্বৈততা একেশ্বরবাদের সৌন্দর্য—এক যদি প্রত্যেক অনু-পরমাণুতে অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহলে একত্ব এবং বহুত্বের কোন সংঘাত থাকে না।

ঋষিরা সকল বস্তুর মধ্যে এক ঈশ্বরের প্রকাশ দর্শন করতেন। আলোর মধ্যে তাঁর প্রকাশ, বায়ুর মধ্যে তাঁর প্রাণশক্তি, অগ্নির মধ্যে তাঁর উজ্জ্বলতা। সর্বভূতে ঈশ্বরের অনুভূতিতে হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয়। তাই ঋষি নিঃসংশয়ে ঘোষণা করেছেন : 'সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, ঈশা বাস্যম্ ইদং সর্বং'। সকল কিছু এক ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছাদিত।

বেদের শ্লোকগুলোতে একেশ্বরবাদের দৃঢ়তা বেদ সর্বত্র একেশ্বরবাদের পুনরাবৃত্তি করে। ঋগ্বেদ (৬/৪৫/১৬)-এ বলা হয়েছে :

য এক ইত্তম ষ্টুহি কষ্টীনাং বিচর্ষণিঃ।
পতির্জজ্ঞে বৃষক্রতুঃ।।

তোমরা সেই এক ঈশ্বরের প্রার্থনা করো, যিনি সর্বজ্ঞ, মহাবিশ্বের কর্তা, সর্বশক্তিমান এবং ধনদাতা। ছান্দোগ্য উপনিষদ (৬/২/১-২)-এ দৃঢ়ভাবে : 'একমেবাদ্বিতীয়ম্'; ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়। বেদের শতাধিক মন্ত্রে 'কেবল তিনিই', 'একমাত্র তুমিই' বলে একত্ব ঘোষিত। অথর্ববেদ (১৩/৪/১৬-১৮)-এর মন্ত্রগুলো একত্বের চূড়ান্ত প্রমাণ :

ন দ্বিতীয়ো ন তৃতীয় শ্চতুর্থো নাপ্যুচ্যতে।
ন পঞ্চমো ন ষষ্ঠঃ সপ্তমো নাপ্যুচ্যতে।
নাষ্টমো ন নবমো দশমো নাপ্যুচ্যতে।

য এতং দেবমেক বৃতং বেদ।।

পরমাত্মা এক; তাঁর পর দ্বিতীয় থেকে দশম পর্যন্ত কোন ঈশ্বর নেই। যিনি তাঁকে এক বলে জানেন, তিনিই তাঁকে প্রাপ্ত হন। এক ঈশ্বর চিন্তা জ্ঞানীর, বহু ঈশ্বর ধারণা মূর্খের। বৈদিক শাস্ত্রে ঈশ্বরের অসংখ্য গুণবাচক নাম রয়েছে, যার মূল 'ওম্'—তৈত্তিরীয় উপনিষদ (১/৮) : 'ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতীদং সর্বম্'। ওমই ব্রহ্ম, যা সকল জগৎ ব্যাপ্ত। এক ব্যক্তির মতো, ঈশ্বরের গুণ-কর্ম অনুসারে নাম পরিবর্তিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, ঋগ্বেদ (১/১৬৪/৪৬)-এ আবারও স্মরণ : এক সত্তাকে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি ইত্যাদি নামে বলা হয়।

সরস্বতী : বিজ্ঞান-জ্ঞানের সমাহার। 'সরো বিবিধং জ্ঞানং বিদ্যতে যস্যাং চিতৌ সা সরস্বতী'—যাঁর চিত্তে বিবিধ বিজ্ঞান আছে।

ব্রহ্মা : জগৎ রচয়িতা। 'যোগ খিলং জগন্নির্মাণেন বৃহতি বর্ধয়তি স ব্রহ্মা'।

বিষ্ণু : চর-অচরে ব্যাপক। 'বিষ্ণুর্বিশাতের্বা ব্যশ্নোতের্বা' (নিরুক্ত ১২/১৮)—ব্যাপকতায় এবং যোগিদের দর্শনে।

শিব : কল্যাণকারী। 'শিবু কল্যাণে' ধাতু থেকে—কল্যাণস্বরূপ।

লক্ষ্মী : সকল চরাচর দেখেন এবং চিহ্নিত করেন। 'যোলক্ষয়তি পশ্যতঙ্কতে চিহ্নয়তি চরাচরং জগৎ... স লক্ষ্মীঃ সর্বপ্রিয়েশ্বরঃ'।

এই নামগুলো এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন দিক—গুণ, কর্ম এবং স্বভাব অনুসারে। সনাতন ধর্ম একেশ্বরবাদী, যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ একের প্রকাশ। এই জ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে লাভ করা যায়, যা হৃদয়কে আলোকিত করে।

বৈদিক একেশ্বরবাদ আমাদের শেখায় যে, বিশ্বের প্রতিটি কণায় এক ঈশ্বর বিরাজমান। এই সত্য উপলব্ধি করলে জীবন আনন্দে পূর্ণ হয়, এবং বহুত্বের বিভ্রান্তি দূর হয়। ■

শুভেচ্ছা বার্তা

সম্মানীয় সনাতনী নাগরিকবৃন্দ পশ্চিমবঙ্গে ২০২৬ এ নির্বাচনে হিন্দু সমাজ তাঁদের নিরঙ্কুশ মতদানের মাধ্যমে এবং কার্যকর্তাদের নিরলস পরিশ্রমের শেষে ফলাফলের বহিঃপ্রকাশ নিয়ে এসেছে। এই উজ্জ্বল ফলাফল সনাতনী সমাজের ঐক্যতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার পরিচয়কে তুলে ধরেছে। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং অন্যান্য সনাতনদের দ্বারা জনজাগরণের ফলে মাতৃশক্তি, দুর্গাশক্তির উদয় হয়েছে এবং শতভাগ ভোটদানের প্রতি আগ্রহকে বাড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের সচেতন মানুষদের নির্ভীকতার সঙ্গে মতদান সর্বকালের রেকর্ড সৃষ্টি করেছে, যা বিশ্বের অন্য কোন গণতন্ত্রে এখনো পর্যন্ত দেখা যায়নি। স্বচ্ছ ভোটদানের প্রক্রিয়া এবং সুরক্ষার বাতাবরণ তৈরি করার জন্য ভারতবর্ষের নির্বাচন কমিশন এবং মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমার তথা পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন আধিকারি মনোজ কুমার আগারওয়াল এবং ভারতের সুরক্ষা বাহিনীকে ধন্যবাদ জানানো দরকার। পশ্চিমবঙ্গে এই প্রথম রক্তপাত হীন নির্বাচন তাদের কঠোর পরিশ্রম এবং সজাগতার জন্যই হয়েছে।

এই নির্বাচনে পত্র-পত্রিকা, সোশ্যাল মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়ার ভূমিকা ও প্রশংসনীয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বাংলা মুখপত্র বিশ্ব হিন্দু বার্তা গত ৫২ বছর ধরে সনাতনীদের মধ্যে স্বদেশপ্রেম ও স্বধর্মে স্বভিমানকে জাগ্রত করার জন্য নিরলস কাজ করার সু-পরিনাম আমরা পেয়েছি বলেই আমাদের বিশ্বাস। আপনাদের আশীর্বাদ ধন্য হয়ে বিশ্ব হিন্দু বার্তা আগামী দিনে আরো বেশি শক্তিশালী হয়ে সনাতনী জাগরণের কাজ করে যাবে এই বিশ্বাস। পুনরায় সকল সচেতন সনাতনী নাগরিকদের অভিনন্দন জানাই।

বন্দেমাতরম।। ভারত মাতার জয়।।

হনুমানজী : বর্ণ-ধাতু থেকে অর্থতত্ত্বাদির সাম্প্রতিক প্রেক্ষিত-চারণা

ড. শ্যামলচন্দ্র দাস

একদা ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে হিন্দু দেব-দেবীর নামকে কেন্দ্র করে উত্তরসূরী সন্তান-সন্ততির ব্যক্তি-নাম নির্ধারিত হত। সেই নাম কেবলই ডাকনাম, বা খেতাব নাম নয়, বরং অন্য একটি ভদ্র আলাদা নামও কাগজ-কলমে হয়ে উঠত জনপ্রিয়। যেমন শঙ্করাচার্য (দেবাদিদেব মহাদেবের একটি নাম শঙ্কর), রবিদাস (বাচ্যার্থে সূর্যের দাস), গোবিন্দ (শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর), লোকনাথ (লোকের নাথ বা প্রভু), রবীন্দ্রনাথ (রবি-ইন্দ্র-নাথ, ইন্দ্র হলেন স্বর্গের দেবরাজ), শ্যামাপ্রসাদ (দেবী শ্যামার প্রসাদ) ইত্যাদি। হিন্দু সমাজে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী আজও প্রচলিত ভারতীয় মহিলাদের নাম।

কিন্তু দেবতা নারদ তেমন করে ব্যক্তি নাম হিসেবে হিন্দু সমাজে প্রচলিত নয়। যদিও কয়েক বছর পূর্বে সংঘটিত নারদা কেলেঙ্কারি ব্যতিক্রম হিসেবে স্মর্তব্য। সেই সঙ্গে 'নারদ কাঠি', 'নারদীয় রীতি', 'নারদের কলহ' ইত্যাদি প্রবচনও রাঢ় পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত রয়েছে। অনুরূপ ভাবে হনুমানজি কেন্দ্রিক ব্যক্তি—নামও তেমনটা হিন্দু সমাজের সুলভ নয়। বরং শ্রীনারদ বা হনুমানজি কেবলই ভারতীয় হিন্দু সমাজের উপাস্য দেবতা। যদিও হিন্দু বাঙালির উপাস্য দেবতা হিসেবে বজরংবলী তথা হনুমানজিকে অনেকে অন্তর্ভুক্ত করতে নারাজ। যদিও আজকে তা আর জল-অচল সীমারেখা দিয়ে আটকে রাখা মুশকিল। তাছাড়া দেবতাদের প্রতি মানসিক আকর্ষণ ও উপাসনা গোষ্ঠী বা ব্যক্তি ভেদে, এমনকি কাল ভেদেও বদল হতে পারে। তার মানে একটি বিশেষ দেবতা অ-বাঙালির বলে বিশেষ সম্প্রদায়ের মধ্যে আটকে থাকবেন এমন হতে পারে না। ব্যক্তির ভালো-লাগা দেবোপাসনা গোষ্ঠিতে কালক্রমে সম্প্রসারিত হতেই পারে। যেমনটা ভারতীয় বাঙালি হিন্দু সমাজে বজরংবলী উপাসনা বর্তমানে অনেকটাই সম্প্রসারিত হয়েছে, অন্তত শহুরে এলাকায়। তা সে বজরং দল বা হনুমান মন্দির স্থাপনের ক্ষেত্রে এমনটা লক্ষণীয়।

যাই হোক, এই দেবতা আসলে কতগুলো বর্ণ সমষ্টির ফলে নির্মিত শব্দব্রহ্ম, যা কেবল দৃশ্যমান স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ ন আ র দ, হ ন উ ম আ ন সহযোগে সৃষ্ট। এক্ষেত্রে তিনটি দন্ত্য-ন বিদ্যমান। আর এই ন হল জাগতিক দেহ ও মনকে আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণ করবার প্রক্রিয়া, জাগতিকতা থেকে আত্মায় অভিবাসন, উচ্চমার্গীয় চেতনা জাত ধ্যান, আধ্যাত্মিক শীলন ইত্যাদি দ্যোতক। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত নারদ সম্পর্কে যেমন উক্ত অর্থ-প্রসঙ্গ প্রযোজ্য, তেমনি হনুমানজির ক্ষেত্রে তা অধিকতর প্রযোজ্য, কেননা এই শব্দে দুটি দন্ত্য-ন-এর সমাবেশ ঘটেছে।

বস্তুত এই পৌরাণিক বা আধ্যাত্মিক দেব নামের বাচ্যার্থ থেকে বর্ণার্থ, সাংস্কৃতিক অর্থ, তান্ত্রিকার্থ, জ্যোতিষার্থ ইত্যাদি একাধিক অর্থ এখানে অনুসন্ধান করতেই পারি। বাংলা ভাষার ন বা ইংরেজি ভাষার ঞ্ব বর্ণের অর্থ হল গতিশীলতা, অন্বেষণে আনন্দ, পরোপকারে ঝোঁক তথা আকর্ষণ। পবন পুত্র হনুমানের চাঞ্চল্য বা গতিশীলতা ছিল অকল্পনীয়। রামানুজ লক্ষ্মণ রাবণের শক্তিশেলে মুমূর্ষু হলে সঞ্জীবনী বুটি ঔষধ সন্ধান ও দ্রুতগতিতে দ্রোণাচল আনয়নের প্রসঙ্গ আমাদের অনেকেরই জানা। পরোপকারের কথা আজও স্মরণ করতে হয় 'হনুমান চালিসা', 'রামায়ণ' বা 'শ্রীরাম পাঁচালী' অনুসরণ করে। কথা হল, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূলীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে যাচাই করলে দেখা যায় নিজের আখের গোছাতেই সকলে প্রায় ব্যস্ত, আমজনতার সেবা দেওয়ার নিঃস্বার্থ মনোবৃত্তি প্রায় নৈব নৈব চ; অথচ হওয়া উচিত ছিল 'পরের কারণে মরণেও সুখ'। কিন্তু হয়ে গেছে উল্টোটা।

তা সে যাই হোক, মনোবৃত্তি প্রসঙ্গ স্মরণে রেখে বলা যায়, ম হল মন। পার্থিব, স্বার্থপর, ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ সত্তার মন এটি নয়, বরং উদার, মুক্ত, উপকারী, ভক্তিপ্রবণ, গভীর আধ্যাত্ম্য সচেতন, আত্মোন্নিত, সুচিন্তিত দৃষ্টিশক্তির ব্যঞ্জক মন। অর্থাৎ একটি ছোট সংকীর্ণ আমি-যুক্ত মনকে সরিয়ে বড়ো-আমির সমুন্নত চেতনা, আত্মিক উন্নতি, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদির দিকে দৃঢ় ইচ্ছাশক্তিতে চরৈবেতির নাম মন বা সুম(ন)। 'মন'-কে ভারতীয় অন্যান্য ভাষায় 'মান' উচ্চারণ করা হতে পারে। উচ্চারণ যেমনই হোক, এমন শক্তিশালী মনের অধিকারী ব্যক্তিত্ব সচরাচর দেবাবতার ছাড়া খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আবার অন্যদিক থেকে হস্তরেখা বিচার শাস্ত্রে

দেখা যায়, হাতের তালুতে ধ্বজ চিহ্ন থাকলে তা আসলে বোঝায়—'ability to overcome challenges', অথবা 'intuition and insight'-ও বোঝায়। পৌরাণিক মত অনুযায়ী, শাস্ত্রজ্ঞ হনুমানজির ছিল বুদ্ধি, স্বজ্ঞা, অন্তর্দৃষ্টি ইত্যাদি জাত একাধিক গুণ। সেইসঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার অভূতপূর্ব শারীরিক-মানসিক শক্তি। কেননা দ্রোণগিরি উত্তোলন করে আনার ক্ষেত্রে তাঁর শারীরিক বলবত্তার প্রমাণ পৌরাণিক ভাবেই পাওয়া যায়।

এবার হ প্রসঙ্গে আসা যাক। সংস্কৃত বর্ণমালার অন্তিম বর্ণ এটি। কণ্ঠ্যবর্ণও। বাংলা ভাষার বর্ণ ধরলে হ কণ্ঠ্যনালীয় ও ঘর্ষণজাত উষ্ম বর্ণ। আবার শ্বাস-প্রশ্বাস বা 'breath of life' বলেও হ-কে গণ্য করা হয়। এই শ্বাস-প্রশ্বাস একটি জীবিত অস্তিত্বের মধ্যে যতক্ষণ সচল থাকে ততক্ষণই তার মূল্য, আর তা থেমে গেলে জীবিত অস্তিত্ব নিষ্প্রাণ, মূল্যহীন। কাজেই বোঝা যায়, পৌরাণিক এই সত্তার মধ্যে এমন এক বর্ণের বিগর্ভন রয়েছে, যার গুরুত্ব জীবন্ত প্রাণীজগতের ক্ষেত্রেও অপরিসীম।

যদিও সাংস্কৃতিক অর্থ ধরলে বর্ণগতভাবে হ হল চাঞ্চল্য বা সচলতা দ্যোতক। সেক্ষেত্রে বেগবত্তা বা গতিশীলতা অনেক সময় আভাসিত হয় ম-এর মতো। যেমন বাস্তব জগতের জীবন্ত হনুমানের আওয়াজ 'হুপহাপ' যে শব্দ ধ্বনিত হয় (রাঢ় মুর্শিদাবাদ এলাকায় শিশুদের লোকছড়ায় প্রচলিত রয়েছে—'হনুমান হুপ, কলা খাবি তো চুপ'!) তা চঞ্চল-অস্থিরভাবে লাফানো-ঝাঁপানোর ব্যঞ্জক। তাছাড়া হনুমানের বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায় ইতঃস্তত লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে বেড়ানো আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করে থাকি। আবার 'হনহন' করে চলা, 'হনহনিয়ে' ছুটে যাওয়া, 'হনহনানো' ইত্যাদি আসলে গতিশীলতাকে আভাসিত করে। সামাজিক মানুষ যে নিরন্তর ভালো কিছু প্রাপ্তির প্রত্যাশা করে থাকে তাও আসলে মানসিক গতিশীলতা তথা অভিসার হিসেবে ধর্তব্য হতে পারে। তবে সবসময় ভালো না হয়ে খারাপ বা মন্দও হতে পারে। তবু তা অদৃশ্য গতিই, ঊর্ধ্ব হোক বা অধো।

আবার অনেক সময় দেখা যায়, চাঞ্চল্য বা অস্থিরতাকে নাশ করে, স্থির করে এই বর্ণই। যেমন 'হ' নির্ভর একক বর্ণের বাংলা শব্দ। বর্তমান বাংলাদেশের বঙ্গালী উপভাষায় যখন বলা হয়—'হ এবার থামেন'। তখন চঞ্চলতাকে স্থিরতায় পরিবর্তন করা হয়। অথবা রাঢ় এলাকার গাড়োয়ান বা হাল-চাষী যখন গরুকে 'হ হ' বলে থামায়, তখন আসলে গতিশীলতাকে স্থিতিশীলতায় রূপান্তর করতে প্রয়াস করা হয়। আর মানসিকভাবে যখন আমরা স্থির হতে চেষ্টা করি, তখন সামনে মাথা ঝাঁকিয়ে বা নাড়িয়ে 'হ হ' ধরনের অঙ্গভাষা প্রয়োগ করে থাকি। তাছাড়া মুখের যেমন 'হাঁ' আছে, যা অস্থির রূপ পেয়েও এক এক সময় স্থির হয়, তেমনি মনের স্থির গ্রাসকে আমরা বলতে পারি 'হ্যাঁ'। এই হ্যাঁ আসলে মনের অস্থিরতা রোধক সমর্থন। এইভাবে দেখলে চঞ্চল অস্তিত্ব, মন বা আত্মাকে স্থিরকরণে সহায়ক এই হ বর্ণ। আবার আঞ্চলিক রাঢ়ী শব্দ 'থিতু' হওয়া শব্দের মধ্যেও রয়েছে হ নামক নিহিত প্রাণবায়ু। সাধারণ ভাষাবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ত+হ=থ হয়ে থাকে। এখানেও স্থিতির আভাস লক্ষণীয়। কেননা শব্দটির অর্থও তা-ই। অর্থাৎ ভাষাবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে, অল্পপ্রাণ বর্ণের সাথে হ প্রাণবায়ু যুক্ত হলে মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত হয়। অর্থাৎ অল্পপ্রাণকে মহাপ্রাণ, মহাপ্রাণকে আরও মহাপ্রাণ হতে সহায়তা করে এই হ ধ্বনি বা বর্ণ। হ-এর পাশে রয়েছে ন, উ, ম, আ, ন-এর সঘোষ নাদ। কারণ স্বরধ্বনি ও নাসিক্য ধ্বনি আসলে উচ্চারণের সময় বাগ্‌যন্ত্রের স্বরপল্লব দুটিকে অধিকতর পরিমাণে কাঁপাতে হয়। ফলে তৈরি হয় ঘোষজাত নাদ। রাম-লক্ষ্মণের রামায়ণ বা সেকালের সীতায়ণকে ভক্তিপ্রাণ হনুমানজিই নানাভাবে সহায়তা করেছিলেন। সঘোষে, সশব্দ ঘোষণাতেও। সে পৌরাণিক ফিরিস্তি অশেষ, অন্তহীন। তাই মুলতবি-যোগ্য।

অন্য আরেকটি হ-নির্ভর শব্দ-প্রসঙ্গ আলোচনা করা যেতে পারে। হাঁস বা 'হংস' যেমন দুধ আর জলের মিশ্রণকে আলাদা করে দুধ খেতে পারে, তেমনি চঞ্চলতা ও স্থিরতার মধ্যে ভারসাম্য রক্ষার প্রবণতা দেখা যায়।

আবার হাঁস আত্মা-পরমাত্মার প্রতীক বা টোটেম। বৈদিক ও তান্ত্রিক মতে, এটি শিব তথা নারায়ণ ঋষির প্রতীক। আবার এটি ব্রহ্মার বাহনও বটে। আবার এই হংসকে উল্টে দিলে 'সোহং' হয়ে যায়, যার অর্থ আমিই সেই। এক্ষেত্রে আত্মা দৈবী পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়ে যায়, হয়ে যায় স্থির। এইভাবে পার্থিব আত্মা ও স্বর্গীয় দৈবশক্তির মধ্যে রক্ষিত হয় ভারসাম্য। তৈরি হয় ঐশ্বরিক ও পার্থিব যোগাযোগ, তৈরি হয় আধ্যাত্মিক ও জাগতিক ভারসাম্য। হনুমান শব্দের হ-ও তদনুরূপ ভারসাম্য রক্ষার বর্ণ। কেননা বানরকুলের জাগতিকতার সঙ্গে মানবতার

প্রভু শ্রীরামের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তিপ্রাণতার ভারসাম্য তাঁকে রক্ষা করতে হয়েছিল। আবার পরস্পর বিরোধী গুণ, যেমন ধৈর্য মিশ্রিত তেজ, নীতির সঙ্গে সারল্য, সামর্থ্য, বিনয়, পৌরুষ ও বুদ্ধি এই পৌরাণিক দেবতা চরিত্রের মধ্যে সহাবস্থান করেছিল।

আবার হ-কে যদি আমরা 'হিলিং' বা নিরাময়ের সঙ্গে অন্বিত করে ভাবি তাহলে বলা যায়, শ্বাস-প্রশ্বাসের অস্থিরতা অতিক্রম করে নিয়মিত আত্মিক উপলব্ধির মাধ্যমে পরমেশ্বরের সাথে সংযোগ সাধনের প্রয়াস আসলে আত্মিক নিরাময়ের উত্তরণ ক্ষেত্র। হনুমান শব্দে হ-এ লগ্ন রয়েছে অ, হ-এর পরে ন-এ যে উ লেগে রয়েছে, তা আসলে বিষ্ণু বা নারায়ণের বর্ণ প্রতিরূপ। পরেই রয়েছে ম, যা শিব বা মহেশ্বরের প্রতীক-বর্ণ। মোটকথা বর্ণ-সংগঠন ধরলে হনুমা(ন) শব্দে নিহিত অউম আসলে তিন হিন্দু দেবত্বের প্রতীকী বর্ণ। এইভাবে হ-এর সঙ্গে একটি নীরব অ, ন-এর সঙ্গে একটি দৃশ্যমান উ, তারপর আকার যুক্ত, সম্প্রসারিত ম, শেষে আরও একটি ন, সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছে শব্দ হনুমান।

আবার হ-এর মধ্যে রয়েছে স্থূলতাও। বিভিন্ন বাংলা হ-বাচক শব্দ পর্যবেক্ষণ করলে তা প্রতীয়মান হতে পারে। হনুমানের শারীরিক গঠনের স্থূলতা বা দীর্ঘাকার অবয়ব না থাকলে পর্বত আনন সম্ভব হতে পারে? প্রশান্ত পর্বত বা ভীষণ বিন্ধ্যা পর্বতের মতো দেহ, বিশাল থামের মতো দৈহিক দৈর্ঘ্য ছিল তাঁর। সিংহিকা রাক্ষসী জীবদের ছায়া আকর্ষণ করে খেয়ে ফেলত। হনুমানজিকেও সেভাবে আকর্ষণ করলে তাঁর শরীরকে স্ফীত করতে শুরু করেন। বাঙালি কবি কৃত্তিবাস বাংলা ছন্দে হনুমানের দৈহিক আয়তন বৃদ্ধির প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেছিলেন। যাই হোক, বিষয়টি রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী 'ধ্বনি-বিচার' প্রবন্ধে যথেষ্ট নমুনা সহযোগে তা বিচার করেছেন। তাঁর একটি উদ্ধৃতি প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—'মহাপ্রাণ বর্ণের বেগবত্তা, বলবত্তা, স্থূলতা, সমস্তই হ-কারাদি শব্দে বিদ্যমান।'

এমনিতেই হ বর্ণের মধ্যে রয়েছে শারীরিক-মানসিক বলবত্তা, তার ওপর রয়েছে ঐশ্বরিক সুরক্ষা কবচ। একনিষ্ঠ, শুদ্ধ, নিত্য, নিষ্কাম রামসাধক বলে রামচন্দ্র তাঁকে রক্ষা করেন, তেমনি মানসিক দিক থেকে তিনি বাগ্মী, ব্রহ্মজ্ঞ, মহাজ্ঞানী, যার মধ্যে নেই উগ্র হিংসা, দ্বেষ, অহংকার, বিভেদ; বরং আছে বিনয়, ভক্তি, প্রেম, মৈত্রী ইত্যাদি সদর্থক গুণাবলী। শারীরিক শক্তিতেও তিনি অবিসংবাদিত শক্তির প্রতিমূর্তি, যার পর্বত উত্তোলন বায় হাত কা খেল! আর সেজন্যই তিনি বজরংবলী, অর্থাৎ যার বজ্র বা হীরার ন্যায় শক্তিশালী অঙ্গ, তিনিই বজর-অঙ্গ-বল-ঈ।

মানসিকভাবে তিনি অভূতপূর্ব শক্তির অধিকারী বলেই তিনি হিন্দু মনুষ্য সমাজে আজও অবশ্য মান্য চিরজীবী দেবাবতার। যেহেতু তাঁর শব্দের শেষাংশ 'মান'-এ রয়েছে গর্ব-সম্মান, এমনকি তথাকথিত অহংকারও, সেজন্যই তিনি প্রকৃত ভক্ত মানীজনদের সংকট মোচন করে থাকেন। কিন্তু বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, এমন কি সার্বিক অনুন্নয়নের সংকট মোচন করতে তিনি পারবেন কিনা, তা বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফলের দিন অর্থাৎ ৪ই মে, ২০২৬ তারিখে বোঝা যাবে।

চেতনা বা চৈতন্য জাগরণের সঙ্গে যেমন দন্ত্য ন-এর ভূমিকা রয়েছে, তেমনি হ-এর ভূমিকাও আছে, কারণ চেতনা লাভের প্রসঙ্গ আঞ্চলিক রাঢ়ী বাংলায় বলা হয়ে থাকে 'হুশ'। অনেকেই রাঢ়ী এলাকায় বলে থাকেন—মান ও হুশ মিলিয়ে মানুষ। আর চঞ্চল, গতিশীল প্রাণপাখি গতিশীল হয়ে 'হুস' করে পালিয়ে যাওয়ার আগে এই মানুষের যখন 'হুশ ফেরে' তখনই সে হয় সচেতন মানুষ। আধ্যাত্মিক ভাবে সচেতন হলে সাধারণ লোকও হয়ে যান মহামহিম প্রাণ। ভক্তপ্রাণ মানুষ হয়ে থাকেন 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন...', ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য।

এবার আমরা হনুমান শব্দের মূলে যে ধাতু 'হন্' নিহিত রয়েছে সেই প্রসঙ্গ আলোচনা করতে পারি। সংস্কৃত হন্ ধাতুর অর্থ হল হত্যা করা, বধ করা, তাড়িত করা, গমন করা, হিংসা করা ইত্যাদি। এই ধাতুর অর্থের সাথে জড়িত শব্দগুলো বাংলায় প্রচলিত রয়েছে সেগুলো হল ঘাত, হন্য, হনু/হনূ, হত, হন্তা, হত্যা, হনন, হন্তব্য, হন্যমান, হন্তারক, হননীয়, হানাহানি ইত্যাদি (যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ-এর ২০ নম্বর শ্লোকের শেষাংশ—'...ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে')। হনুমানজী আসলে একাধিক নেতিবাচক মূল্যবোধের হত্যাকারীই নন, বরং ইতিবাচক মূল্যবোধের সমর্থক, ধারক-বাহক। ভক্তি-প্রেম, পরোপকার, দয়া, মৈত্রী, ভালোবাসা, উদারতা, আত্মসুখ বিসর্জন, নেতৃত্ব দান ইত্যাদি

তাঁর সমর্থন পায়। সেজন্য তিনি এই গুণাবলীকে 'মান' দেন, তা নিয়ে গর্ববোধ করেন। সেজন্যই তিনি হনমান। এই শব্দে পরে উ-কার যুক্ত হয়ে ভারতীয় তথা বাংলা শব্দটি পূর্ণতা পায়।

তবে অন্য মত রয়েছে। হনুমান শব্দের মূলে রয়েছে হনু। হনু শব্দের অর্থ হল চোয়াল। হনুমত-এ হিন্দি শব্দ 'মত'গু না। অপর হিন্দি শব্দ 'মান', অর্থাৎ বিশিষ্ট। তবে অনেকের মতে, বিকৃত, কদাকার, ভগ্ন, আহত, বড়ো ইত্যাদি অর্থ এই মান শব্দে নিহিত রয়েছে। যাই হোক পৌরাণিক আখ্যান অনুসারে বলা যায় যে, শৈশবকালে হনুমান নবোদিত সূর্যকে ফল ভেবে গ্রাস করতে গেলে, পরে রাহু ও ইন্দ্রের ঐরাবতকে ফল ভেবে খেতে গেলে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁর বজ্র দিয়ে বাম চোয়াল বা হনুতে আঘাত করেন, ফলে চোয়াল বিকৃত, ভগ্ন, কদাকার, বৃহদাকার রূপ পায় (পরে ব্রহ্মার করস্পর্শে পুনরুজ্জীবন প্রাপ্তি ঘটে) সেজন্য দেবরাজ ইন্দ্ররাজ তাঁকে হনুমান নাম দেন, পরবর্তীতে বজ্রের আঘাতে তাঁর মৃত্যু হবে না বলে তাঁর নাম দেন বজরংবলীও।

যাই হোক, ব্রহ্মা তথা সৃষ্টির আদি বর্ণরূপ অ-এর পরিবর্তে হ-র সংগঠনকে বাংলা ভাষায় ইচ্ছাকৃতভাবে মজা-মশকরা, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতে গিয়ে অনেক সময় নতুন নতুন শব্দ তৈরি হয়, যাতে সৃষ্টির ব্যঞ্জনা ছাড়িয়ে ওলট-পালট হয়ে গিয়ে অন্য তাৎপর্য-মাত্রা তৈরি হতে পারে। যেমন অনুগ্রহ > হনুগ্রহ (তাচ্ছিল্যে দয়া-দাক্ষিণ্য; locked jaws-ও), অনুমান > হনুমান (মস্করায় আন্দাজকরণ), অনুব্রত > হনুব্রত, অনুকরণ > হনুকরণ (তাচ্ছিল্যে হুবহু কপি) ইত্যাদি। এমনও দেখা যায়, মান্য কেন্দ্রীয় বাংলা ভাষায় হ বর্ণের লেখ্যরূপকে উচ্চারণের ক্ষেত্রে অনেক সময় গুরুত্ব দেওয়া হয় না, অন্তত বিষম যুক্ত ব্যঞ্জনওয়ালা শব্দের ক্ষেত্রে। শব্দস্থ হ পূর্বে থাকলেও পশ্চাদমুখিতা তৈরি হয়—যেমন চিহ্ন, ব্রহ্ম, প্রহ্লাদ ইত্যাদি শব্দে হ পরে উচ্চারিত হয়। আবার বিষম যুক্ত ব্যঞ্জনে থাকা হ-কে অন্যরূপে রূপান্তরিতও করা হয়, যেমন আহ্বান, জিহ্বা, সহ্য ইত্যাদি। অবশ্য এ দিকটি আমাদের আলোচ্য নয়।

সর্বোপরি, চৈত্র পূর্ণিমার হনুমান জয়ন্তীর পর একথা স্বীকার্য যে, এই অর্ধ-নর-বানর দেবতার নামকরণের ক্ষেত্রে যে ধরনের বর্ণ, ধাতু, রূপমূল বা অক্ষর, অর্থাদি নিহিত রয়েছে তা পৌরাণিক-আধ্যাত্মিক প্রেক্ষাপটের সাথে মিলিয়ে একালের প্রেক্ষিতে দেখলেও এই আলোচনার প্রাসঙ্গিকতা আজও প্রতীয়মান হতে পারে। ■

রামনবমীর শোভাযাত্রা, উত্তর কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গ

ভগবান বুদ্ধের আবির্ভাব ও মহা নিষ্ক্রমণ

গোপাল চক্রবর্তী

গত সংখ্যার পর...

আবার একদিন অরণ্যের শোভা দর্শনে গিয়ে এক রোগগ্রস্ত ব্যক্তির কষ্ট, দুঃখ, অসহায়তা প্রত্যক্ষ করে চিন্তাক্লিষ্ট কুমার প্রাসাদে ফিরলেন। তৃতীয়বার রাজা শুদ্ধোদন নবরসে কুমারকে আপ্লুত করার জন্য, প্রমোদ উদ্যানে কলাবিদ্যায় পারদর্শী শ্রেষ্ঠ বারাঙ্গনাদের পাঠিয়ে রথ এবং সারথী পরিবর্তন করে কুমারকে ভ্রমণে পাঠালেন। এবারও দেবতার মায়ায় এক অসার দেহ বাহিত হতে দেখে, সারথির কাছে জানলেন ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃত্যু ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, চেতনার বিনাশ ঘটিয়ে মানুষকে শুষ্ক কাষ্ঠের মতো নির্জীব সত্তায় পরিণত করে। মহাত্মা, মধ্যম, হীন সকলেরই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। বিষন্ন, দুঃখিত, স্তম্ভিত কুমার জীবনের শোচনীয় পরিণাম মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করে প্রাসাদে ফিরতে চাইলেও, রাজার নির্দেশে সারথি তাঁকে পদ্মখণ্ড উদ্যানে নিয়ে গেলেন। সেখানে বারাঙ্গনারা কুমারকে বেষ্টন করে বিভিন্ন কলাবিদ্যা প্রয়োগ করতে লাগল। কুমার তখন নবব্রতধারী মুনির মতো বিঘ্ন ভয়ে কাতর হলেন।

মৃত্যু, জরা, ব্যাধির চিন্তায় সমগ্র জগৎ যাঁর কাছে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিসম প্রতিভাত হচ্ছে, সেই কুমার সিদ্ধার্থ, রাজার পুরোহিত পুত্র উদায়ার পুরাণাশ্রিত বহু প্রেমকাহিনী শুনেও অবিচলিত ভাবেই সুন্দরীদের প্রত্যাখ্যান করলেন। তারা নগরে ফিরে গেল। পুত্রের বিষয় পরামুখতার কথা চিন্তা করে রাজা শুদ্ধোধন বিনিদ্র রাত্রি যাপন করতে লাগলেন।

বিষয়ে প্রলোভিত না হয়ে, তীরবিদ্ধ সিংহের মতো অশান্ত কুমার সিদ্ধার্থ। পিতা শুদ্ধোদনের অনুমতি নিয়ে বন্ধু মন্ত্রীপুত্রদের সঙ্গে সারথি যুক্ত রথে আরোহণ করে তিনি অরণ্যের শোভা দর্শনে বেরিয়েছেন। জমি চাষ করায় লাঙলের আঘাতে মৃত কীট-পতঙ্গ দেখে কুমার স্বজন বধের দুঃখ অন্তরে অনুভব করলেন। কৃষক এবং ভার বহনকারী বলদের জন্য তিনি করুণা অনুভব করলেন। বৈদূর্যমুনির মতো শ্যামল তৃণভূমিতে জাম গাছের তলায় বসে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কথা ভাবতে ভাবতে তিনি ধ্যানমগ্ন হলেন। অতঃপর কোন দেবতা জরা-মৃত্যু ভীত এক সন্ন্যাসী শ্রমনের বেশে তাঁকে দর্শন দেন। তাঁকে বিহঙ্গের মতো আকাশে উড়তে দেখে কুমার সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করলেন। কিন্তু পিতা শুদ্ধোদন তাঁকে প্রবজ্যা গ্রহণের অনুমতি দিলেন না। সেদিন সিদ্ধার্থ বন্ধুদের সঙ্গে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। কারণ তিনি না ফিরলে তার বন্ধু এবং সারথিকে রাজরোষে পড়তে হবে। তাদের যাতে কোন রকম অপমান, লাঞ্ছনা, তিরস্কার ভোগ করতে না হয়, সেই কারণেই সম্ভবত করুণ হৃদয় সিদ্ধার্থ তৎক্ষণাৎ পরমকাঙ্ক্ষিত বনে গমন করলেন না। বন্ধুজন নিরপেক্ষ হওয়া সিদ্ধার্থের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাদের প্রতি কর্তব্যবশতঃ তিনি নগরে ফিরে এলেন, সমস্যা গ্রহণ করলেন না। জরা, মৃত্যুর শাসনে বিচলিত সিদ্ধার্থ কামনা বশতঃ নয়, গৃহত্যাগের মনোগত ইচ্ছা স্মরণে রেখেই গজরাজের ন্যায় নগরে প্রবেশ করলেন। কুমারকে নগরে প্রবেশ করতে দেখে রাজপথে দাঁড়িয়ে এক রাজকন্যা অঞ্জলিবদ্ধ করে (হাত জোর করে) বলে উঠলেন, ইহজগতে সেই স্ত্রী অবশ্যই সুখী এবং শান্তি ও সমৃদ্ধশালী, যার এই রকম স্বামী বর্তমান।

এই উক্তি সৌভাগ্যবতী যশোধরার আসন্ন দুর্ভাগ্যের পূর্বাভাস যেন সূক্ষ্ম শ্লেষের আকারেই ব্যঞ্জিত হচ্ছে। যশোধরা সুখী কি দুঃখী সেটি বিতর্কের বিষয়।

কুমার সিদ্ধার্থ প্রাসাদে ফিরে প্রবেশ করে উপস্থিত হলেন পিতা শুদ্ধোদনের কাছে। কৃতাঞ্জলি হয়ে বললেন, ‘হে নর দেবতা! আমাকে সম্মুখ আদেশ করুন। মোক্ষের জন্য আমি প্রবজ্যা গ্রহণ করব। মানুষের বিচ্ছেদ তো স্থির হয়ে আছে।’

পুত্রের কথা শুনে রাজা হস্তির দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত বৃক্ষের ন্যায় বিচলিত হলেন। পুত্রের অঞ্জলিবদ্ধ হাত ধরে, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন, তাত! তোমার এই ইচ্ছা পরিত্যাগ কর। প্রথম বয়সে মন চঞ্চল থাকায়, জ্ঞানীরা ধর্মাচরণকে বহুদোষ যুক্ত বলেছেন, ‘হে ধর্মপ্রিয়, সুলক্ষণ তোমাকে রাজলক্ষ্মী সমর্পণ করে, আমারই ধর্মাচরণের সময় উপস্থিত। হে নিত্য পরাক্রমী বলপূর্বক গুরুজনদের বর্জন করলে তোমার ধর্ম কিন্তু অধর্মেই পরিণত হবে।’

রাজার এই বাক্য শুনে সিদ্ধার্থ ধীর, স্থির, কোমল

কণ্ঠে বললেন, পিতা! যদি চারটি ক্ষেত্রে আপনি আমাকে নিশ্চয়তা দিতে পারেন, তবে আমি গৃহত্যাগ করব না। যথা—আমার জীবন মৃত্যুর জন্য নয়, ব্যাধি আমার স্বাস্থ্যকে হরণ করবে না, বার্ধক্য আমার যৌবনকে ছুড়ে ফেলবে না, বিপদ আমার সম্পদকে হরণ করবে না।

কবি নবীনচন্দ্র সেন অমিতাভ কাব্যে সিদ্ধার্থের প্রবজ্যা গ্রহণ না করার চারটি শর্ত খুব সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন।

দেও দাসে দয়া করি, দিলে চারি বর
থাকিব সংসারে, গৃহ ছাড়িব না আর
জরায় যৌবন-ফুল যেন না শুকায় (১)
ব্যাধি যেন কভু নাহি পরশে আমায় (২)
মৃত্যু যেন নাহি আসেন নিকটে আমার (৩)
পাই সে সম্পদ যাহা অক্ষয় অপার (৫)

কুমার সিদ্ধার্থের এই চারটি শর্ত শুনে রাজা শুদ্ধোদন বললেন, এই অসম্যক চিন্তা প্রসূত বুদ্ধি ত্যাগ কর। মনের অতি অভিলাষ অসঙ্গত এবং উপহাসের যোগ্য হয়।

পিতার কথা শুনে সিদ্ধান্ত বললেন, যদি এটা সঙ্গত না হয়, তবে আমাকেও বারণ করা উচিত নয়। আগুনে প্রজ্জ্বলিত গৃহ থেকে যে বেরুতে চায়, তাকে ধরে রাখা অবশ্যই যুক্তিযুক্ত নয়।

মোক্ষাভিলাসী পুত্রের দৃঢ়তার কথা শুনে রাজা তাকে অবরুদ্ধ করার জন্য উত্তম সুরক্ষা এবং যথেচ্ছ কাম সম্ভোগের ব্যবস্থা করলেন। একদিকে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমার মতো যশোধরা পুত্র সহ সোনার পালঙ্কে শায়িতা, অন্যদিকে বাদ্যযন্ত্রসহ নৃত্য গীতে পটিয়সী বারাঙ্গনা দল, মধ্যেখানে কুমার সিদ্ধার্থ। সেই যথেচ্ছ ভোগের আয়োজন কুমারের কাছে বিষসম মনে হল। রজনী গভীর হলে দেবতার ইচ্ছায় যশোধারা নিদ্রা বিভূতা হলেন, বারাঙ্গনারা তাদের বাদ্যযন্ত্রের উপর সুপ্তিমগ্ন নিদ্রামগ্ন। নিদ্রামগ্ন নারীর বিকৃত রূপ দেখে বিতৃষ্ণা নিরাসক্ত কুমার প্রাসাদের বাইরে এলেন। আকাশে পূর্ণচন্দ্র সমস্ত প্রাসাদের নিদ্রায় আচ্ছন্ন। কুমার সহিস ছন্দককে ডেকে প্রিয় অশ্ব কন্থককে বের করতে বললেন। সেই রজনীতে স্নেহময় পিতা, পত্নী যশোধারা, পুত্র রাহুল, অনুরক্ত প্রজাদের ছেড়ে কন্থকের পিঠে আরোহণ করে পথে বহির্গত হলেন সিদ্ধার্থ। নগরদ্বার আপনা আপনিই উন্মুক্ত হল। ■ *(সমাপ্ত)*

পরিষদ বার্তা

শিলিগুড়ির ভারত মাতা মন্দিরে সাড়ম্বরে উদযাপিত হলো সীতা নবমী

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের শিলিগুড়ি কার্যালয় তথা ভারত মাতা মন্দিরে ২৫ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে মাতৃশক্তি ও দুর্গা বাহিনীর উদ্যোগে সাড়ম্বরে উদযাপিত হল শুভ সীতা নবমী। ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য, ভক্তি এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশে পরিপূর্ণ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের বহু সদস্যা, স্বেচ্ছাসেবিকা ও ভক্তবৃন্দ।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রথাগত শুভ শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, পূজা-অর্চনা এবং প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে দেবী সীতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। মন্দির প্রাঙ্গণ সজ্জিত হয় ধর্মীয় আবহে, যা উপস্থিত সকলের মনে এক বিশেষ আধ্যাত্মিক অনুভূতির সঞ্চার করে।

মাতৃ শক্তি ও দুর্গা বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবিকারা ভক্তিমূলক সংগীত ও ভজন পরিবেশন করেন। তাঁদের সুরেলা কণ্ঠে পরিবেশিত ভজন অনুষ্ঠানের মর্যাদা আরও বৃদ্ধি করে এবং উপস্থিত ভক্তদের হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার ঘটায়। সংগীতের মাধ্যমে দেবী সীতার ত্যাগ, সহিষ্ণুতা ও আদর্শে নারীত্বের বার্তা তুলে ধরা হয়।

অনুষ্ঠানের বিশেষ আকর্ষণ ছিল দেবী সীতার জীবন ও চরিত্র নিয়ে বৌদ্ধিক আলোচনা। সংগঠনের কয়েকজন সদস্যা সীতার আদর্শ, তাঁর ধৈর্য, সতীত্ব, ত্যাগ এবং ধর্মনিষ্ঠার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তাঁরা বলেন, বর্তমান সমাজে নারীশক্তির জাগরণে দেবী সীতার চরিত্র এক অনন্য প্রেরণা। তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজ ও পরিবারে নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

সর্বশেষে সকলের অংশগ্রহণে সমবেত প্রার্থনা ও প্রসাদ বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়। সীতা নবমীর এই সাড়ম্বরে উদযাপন শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং নারীশক্তির সম্মান ও সাংস্কৃতিক চেতনার এক সুন্দর প্রকাশ হয়ে ওঠে।

শ্রীমদ্ভাগবত গীতার প্রাসঙ্গিকতা
হিন্দুস্তানের খ্রিস্টায়ন ও ইসলামায়নের অতীত ও বর্তমান

ওমপ্রকাশ ঘোষ রায়

গীতা আমাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল, নয়তো আজ আর এই ধরাধামের রূপ, রস, গন্ধ উপভোগ করতে হতো না। আপনারা ভাবছেন এই গীতা কি 'শ্রীমদ্ভাগবত গীতা'? না, যখনকার কথা বলছি, সে সময় আমার পক্ষে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা পড়া, বুঝতে পারা কিংবা ভাবনামৃত লাভের বয়সই হয়নি। আমি তখন ৯ পেরিয়েছি, ১০-এ পা দিয়েছি। আমরা ছিলাম শহরের বাসিন্দা। গ্রামের পুকুর, নদী, খাল, বিল সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা ছিল না, আর সেই জলে স্নান করতো ভাবনার অতীত। চাপা কল কিংবা টাইম কলে স্নান করাটাই ছিল আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাস। গীতা ছিল আমারই সমবয়সী এবং সম্পর্কে আমরা এক জ্ঞাতি দাদার একমাত্র মেয়ে। একেবারে দস্যু মেয়ে এই গীতা। সে যে কোন গাছে তরতর করে উঠে যায়, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা পেড়ে আনত। পুকুর তো কোন ছাড়, নদীতেও সাঁতার কাটা তার কাছে একেবারে জল ভাত। আমরা তো আবার পুকুরে নামা একেবারে নিষেধ। সময়টা ছিল বৈশাখ মাস, আমাদের বাড়ির প্রান্ত সীমানায় উজারী বিলের ধারে কুলিপুকুরের ঘাটে বসে মাছের খেলা দেখছিলাম। চোখের পলকে, কি জানি কেমন করে, পাহড়ে গিয়ে আমি পুকুরের জলে পড়ে গেলাম। আমি তো সাঁতারই জানতাম না, আর হাবুডুবু খেতে খেতে প্রাণ যায়, যায়। ভাগ্যিস পুকুরের অপর পাড়ে সে সময় গীতা বেতফল সংগ্রহ করছিল। আমি যখন জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছিলাম, ঠিক তখনই গীতা পুকুরে ঝপ করে ঝাঁপ দিয়ে আমাকে কিভাবে যে তুলে এনেছিল, তা আজও ভাবলে গায়ে কাটা দেয়। শুধু এটুকু মনে আছে, পুকুরের অথৈ জলে আমি গীতাকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছি, যে দুজনেই হাবুডুবু খেতে খেতে একসময় পুকুরের ঘাটের কাছে এসে পৌঁছেছিলাম। তখন আমার চেতনা ছিল না, যদি সেদিন গীতা না থাকতো, তবে যে কি ভয়ানক কাণ্ডটাই না হতো, তা ভাবাই যায় না। গীতা আমাকে পুকুর ঘাটে শুইয়ে রেখে পেট? পিঠে চাপ দিয়ে জল বের করে দেয়। ততক্ষণে বাড়িতেও খবর পৌঁছে গেছে, আমার মা-বাবা ও বাড়ির সকলেই পুকুর পাড়ে এসে উপস্থিত। আমি ভয় পেয়ে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে শুয়েছিলাম। গীতার কাছে আমার পুকুরে পড়ে যাওয়া এবং উদ্ধার পাওয়ার বিবরণ শুনে সকলেই গীতাকে বাহবা দিলো এবং আমি সেই থেকে মা-বাবার শাসনের বেড়াজালে আটকে পড়ি। এখানে একটা কথা বলে রাখি, এরপর যে কদিন আমি গ্রামের বাড়িতে ছিলাম, সকলের অজান্তে এই গীতাই আমাকে সাহস জুগিয়ে সাঁতার কাটা শিখিয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের সাঁতার যেমন—ডুব সাঁতার, আগু-পিছু সাঁতার, জলে ভেসে থাকা ইত্যাদি, সব রকমের জল কৌশল রপ্ত করেছি। সেই যে সাঁতার শিখেছি, তা আজও ভুলতে পারিনি। তার জন্য গীতার কাছে ঋণী হয়ে আছি।

সেই দুর্ঘটনায় বেঁচে যাওয়ার পরে আমাদের গ্রামের বাড়িতে সে বছর গীতা জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়েছিল। সেখানে আমার নামে সংকল্প করা হয় এবং তার উদ্যোক্তা ছিলেন আমার বাবা নিজেই। আর সেই গীতা জয়ন্তী উৎসবের সূচনা লগ্নে সীতাকুণ্ড সংকর মঠের অধ্যক্ষ স্বামীজী জ্যোতিশ্বরানন্দগিরি মহারাজ এবং সাধু-সন্তের একটি দলকে এনেছিল। সেই থেকে আমাদের হিন্দু অধ্যুষিত মুজাফফরবাদ গ্রামে গীতা জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়ে আসছে। প্রতি বছর গীতা পাঠের আসর ছাড়াও যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠানে সাধুসন্তগণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতা সুললিত কণ্ঠে পাঠ হয়ে থাকে এবং গুণীজনদের সমাবেশে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীমদ্ভাগবত গীতার আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হতো। আমার আজও মনে আছে, সঠশ্রাইরানুত চক্রবর্তী, অর্ধেন্দু রুদ্র, অরুণ দাশগুপ্ত (দাদামণি) প্রমুখ বিদগ্ধজন বক্তব্য রাখতে এবং অশ্রুসিদ্ধ কণ্ঠে গীতার বাণী সমূহ বিশ্লেষণ করতেন সংস্কৃত, বাংলা এবং ইংরেজিতে, আর সেখানে উপস্থিত গ্রামবাসী মা-বোনেরা নীরবে ভক্তিতে কান্না করতেন। জানি না গুণীজনদের ভাষণে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার বাণী সমূহের সদর্থক বিশ্লেষণ তাদের কাছে

বোধগম্য হতো কিনা? তাছাড়া মাকরী সপ্তমী উপলক্ষে রক্ষাকালী বাড়ির প্রাঙ্গণের পাশ ঘেসে খরনা খালের একটি স্রোতধারা আমাদের গ্রামের মাঝ বরাবর প্রবাহিত হয়েছে। তারই পাশে বট-অশ্বত্থের প্রাচীন জোড়া বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করে স্নান উপলক্ষে বিশেষ তিথিতে বসতো মেলা এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে হতো চড়ক পূজা। আবার সারা বছর যাতে গীতা পাঠ অনুশীলন করা যায় তার জন্য গীতা সংঘ নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে, যা পরিচালনা করতেন আমার জ্যাঠামশাই। এই রক্ষাকালী মায়ের মন্দিরের পাশেই আমার শিক্ষানুরাগী বাবার দানকৃত জমিতে স্থাপিত হয়েছে মুজাফফরবাদ প্রাথমিক বিদ্যালয়। তিনি সুদীর্ঘকাল মুজাফফরবাদ হাইস্কুলের পরিচালনা কমিটির সেক্রেটারি পদও অলংকৃত করেছেন। আর এই দুটি শিক্ষায়তনকে কেন্দ্র করে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে গড়ে উঠেছে বালিকা মহাবিদ্যালয় এবং বালক মহাবিদ্যালয়। আবার আমার বাবা শহরের দক্ষিণ নালাপাড়াস্থ বাসভবনের রূপায়ণ নামে একটি শিশু শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছেন। আমার ধর্মবেত্তা বাবা ছিলেন শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তিনি শুধু যে শ্রীমদ্ভাগবত গীতার প্রচার করে খান্ত হননি, তিনি ছিলেন একজন নকশাবিদ ও সিভিল ইঞ্জিনিয়ার। আজ আর আমরা বাবা নেই। তিনি ৯৭ বছর বয়সে শ্রীকৃষ্ণের চরণে ঠাঁই নিয়েছেন।

যাক গিয়ে, এবার ফিরে আসি ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে। সবেমাত্র ইংরেজদের বিতাড়িত করে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভূমি (হিন্দুস্তান) ভেঙে পাকিস্তান ও ভারতবর্ষ নামে দুটি দেশের জন্ম হয়েছে। মুসলমানদের পাক পবিত্র স্থান পাকিস্তান (পূর্ব ও পশ্চিম) যার মধ্যে অ-বিভক্ত বাংলার একটি অংশ হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান, যা খিলাফত আন্দোলনের ব্যাপক হিন্দু হত্যা যজ্ঞের মাধ্যমে অহিন্দুদের পরিতোষক মহাত্মা গান্ধী ও জহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ নামক চক্রান্তকারীরা এই ভারতবর্ষ ভাগের জন্য একমাত্র দায়ী। যে গান্ধী বলেছিলেন, 'ভারত ভাগ হলে, আমার লাশের উপর দিয়ে হবে।' কিন্তু ভারতবাসী দেখল, তার বিপরীত দৃশ্যান্তর। সেই সময়ে সরদার প্যাটেল বাস্তবসম্মত উক্তি করেছিলেন, 'এই ভারতবর্ষের দুইটি বিপরীত মেরুর দুই জাতি হিন্দু ও মুসলমানকে নিয়ে কখনো এক জাতি গঠন করা সম্ভব হবে না। অথচ নেহরু ও গান্ধী এই দুই নেতা ও তাদের অনুসারীরা কেউই কখনো তা মেনে নেয়নি।' যার ফলশ্রুতিতে তথাকথিত নিরপেক্ষ দল ও তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে আবারো ভাগ করা। আমরা তো দেখেছি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট থেকে ভারতবর্ষকে ভাগ করে পাকিস্তানের দাবী আদায় করার জন্য মুসলমানরা ডাইরেক্ট একশন শুরু করে। তখন এই বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের 'ক্যালকাটা গ্রেট কিলিং'-এর নায়ক শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দি। যার নেতৃত্বে মাত্র তিন দিনে মুসলমান পুলিশের সহায়তায় মুসলমানরা কলকাতায় হাজার হাজার হিন্দু হত্যা করেছে এবং হিন্দু নারীদের ধর্ষণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে। আর লক্ষাধিক কলকাতাবাসী হিন্দু গৃহহারা ও লুণ্ঠিত হয়েছিল (আর.সি মজুমদার, বাংলাদেশের ইতিহাস, Vol-IV, Page-৪০৮)। কিন্তু তথাকথিত হিন্দু ধর্মনিরপেক্ষ নেতারা ছিল নিশ্চুপ। অবশেষে যা হওয়ার তাই হল, ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ই আগস্ট মধ্যরাতে দেশ ভাগ করে ২৩ শতাংশ মুসলমান ৩২ শতাংশ জমি নিয়ে পাক পবিত্র স্থান পাকিস্তান তৈরি করে ইসলামের চাঁদতারাযুক্ত পতাকা উড়াচ্ছিল এবং পরের দিন ১৫ই আগস্ট হল ভারতের স্বাধীনতা দিবস।

সেই স্বাধীন ভারত রইল গান্ধী, নেহরুর জিম্মাতে, নিরপেক্ষ দেশ হিসেবে। কিন্তু দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমান লোক বিনিময় করা হয়নি। আবার মুসলমানরাও তাদের দেশ পাকিস্তানে গেল না ভারত ছেড়ে, তারা থেকে গেল এই ইন্ডিয়াতে, ভবিষ্যতে এই দেশটাকেও ইসলামী দেশে পরিণত করার মানসে। তাছাড়া বাংলার একটা বড় অংশ 'পূর্ববঙ্গ', 'পূর্বপাকিস্তান' নামে পাকিস্তানের মুসলমানদের দখলেই থাকল। অথচ দেশ ভাগ করার সময়, আজকের কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে দিয়ে দেবার চক্রান্ত হয়েছিল। কিন্তু বাংলার বাঘ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির দৌলতে তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। তদানীন্তন নপুংসক ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ববৃন্দ এবং গদিশীন মুসলমানদের চাটুকার শাসকদলের অবিমৃশ্যকারিতায় তাই পাকিস্তান ও চীন যৌথভাবে ভারতের ১ লক্ষ ১৬ হাজার বর্গ কিলোমিটার জায়গা জোর জবরদস্তি দখল করে রেখেছে। আবার চীন ভারতের অরুণাচল প্রদেশকে তাদের বলে দাবী করে প্রায় ২০০০ বর্গ কিলোমিটার দখল করে রেখেছে। তাছাড়া ভারতের কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান, চীনের সহায়তায় জঙ্গি লেলিয়ে

দিয়ে অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করে চলেছে। ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে যখন চীন, ভারত আক্রমণ করেছিল, তখন ভারতের কমিউনিস্টরাই চীনের পক্ষে দালালি করেছিল, যা আজও আমরা ২০২০ সালেও দেখতে পাচ্ছি। চীন লাদাখের ভারতীয় সীমান্ত দখল করতে গিয়ে যখন অঘোষিত যুদ্ধ শুরু করে, তখন কমিউনিস্টরা কোন উচ্চবাচ্য করেনি। আমাদের বীর জওয়ানরা নিজেদের আত্ম বলিদানের মধ্যে দিয়ে লাদাখ সীমান্তে চীনের আক্রমণ রুখে দিয়েছে।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীর ছিল দেশীয় রাজ্য আর পাকিস্তানের রাষ্ট্রনায়ক জিন্নাহ কাশ্মীরকে দখল করার পরিকল্পনাও করেছিল। কিন্তু কাশ্মীরের মহারাজ তাদের বদ মতলব বুঝতে পেরে, ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে। পাকিস্তান তা মেনে না নিয়ে, ভারতের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। প্রচণ্ড লড়াইয়ে যখন পাকিস্তান বাহিনী পিছু হটতে থাকে, তখন তাদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী জেনেও জহরলাল নেহরু মাউন্টব্যাটেন পাওয়েলের পরামর্শে ভারতবাসীকে হতবাক করে দিয়ে জাতিসংঘের দারস্থ হন এবং রাষ্ট্রসংঘ যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করে, উভয় পক্ষকে স্থিতিবাচক থাকতে নির্দেশ দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে পাকিস্তান কাশ্মীরের একাংশ আজাদ কাশ্মীর নামে দখল করে নেয়। কিন্তু সেখানেই পরিসমাপ্তি হয়নি, কাঁটা থেকেই গেল। তদানীন্তন কংগ্রেস নেতারা ৩৭০ ধারা যুক্ত করে, বিশেষ মর্যাদা দিয়ে কাশ্মীরকে একরকম ভাবে মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়েছে। যার জন্য নেহরুই একমাত্র দায়ী। অন্যদিকে কাশ্মীরের মুসলমানরা ভারত বিরোধী আন্দোলন শুরু করে এবং পাকিস্তান তাতে ইন্ধন জোগাতে থাকে, লেলিয়ে দেয় মৌলবাদী জঙ্গি বাহিনীকে। কাশ্মীরে ভারতের জাতীয় পতাকা আর জাতীয় সংগীত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। এমনকি শেখ আব্দুল্লার আমলেই এই কাশ্মীরে শ্রীমদ্ভাগবত গীতা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীকে বলা হতো উজিরে আজম, আর রাজ্যপালকে বলা হতো সদর-ই-রিয়াসৎ। কাশ্মীরের সংবিধান আলাদা, পতাকা আলাদা, প্রধানমন্ত্রীও আলাদা, অথচ কাশ্মীরকে নাকি বলা হয় ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ। হাজার হাজার কাশ্মীরি হিন্দু পণ্ডিতদের কাশ্মীর ছাড়তে বাধ্য করে, তাদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে, পুড়িয়ে, মন্দির ধ্বংস করে হিন্দু হত্যার যজ্ঞে মেতে ওঠে তারা। কাশ্মীর হয় হিন্দু-শূন্য। পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের সহায়তায় দীর্ঘদিন কাশ্মীরে ভারতের কোন কর্তৃত্বই ছিল না। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং কংগ্রেসই চাইত, কাশ্মীরে যেন ৩৭০ ধারা বলবৎ থাকুক। তারা চায় এই ধারার সুযোগে কাশ্মীরের দুর্নীতিবাজ শাসক চক্র থাকুক। আর ভারতের অধীনে কাশ্মীর ছিল এক অর্ধ স্বাধীন মুসলমান রাজ্য। যার বিরুদ্ধে একমাত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি আন্দোলন করেছিলেন, 'এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান'-এর দাবিতে। যার জন্য ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরেই আত্মহুতি দিতে হয়েছিল শ্যামাপ্রসাদকে।

তবে, ভারতীয় জনতা পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ভারতের সংসদে জনগণের রায়ে গণতান্ত্রিক অধিকারে দ্বিতীয় বারের মতো আসতে পেরে, গত ৫ই আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দে কাশ্মীরের কালাকানুন ৩৭০ ও ৩৬৫ ধারা বাতিল করে দেয় এবং কাশ্মীরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেওয়া চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নেহরু গোষ্ঠী তথা কংগ্রেস পন্থীদের দুর্বল ও ভুল নীতির পরাভব ঘটে। কাশ্মীরিদের উন্নয়নের পথের কাঁটা চিরতরে বিলীন হয়ে যায়। ■ *(ক্রমশঃ)*

রাম উৎসব ও হনুমান জয়ন্তী কার্যক্রম, ত্রিপুরা

রিনিউয়েবল এনার্জি—বিকল্প উর্জ্জা নীতিতে এগিয়ে ভারত

দিলীপ কুমার ঝাঁওর

ইরান, আমেরিকা ও ইজরাইলের মধ্যে যুদ্ধ চলছে, ফলে পৃথিবীর সমস্ত দেশে জ্বালানির সমস্যা দেখা গেছে। ভারতবর্ষেও জ্বালানির সংকট উৎপন্ন হতে পারে, এই সংকটের মোকাবিলা কিভাবে করা যাবে? এর একমাত্র উপায় হচ্ছে এনার্জি সেক্টরেও ভারতবর্ষকে আত্মনির্ভর হতে হবে। আমরা জানি ভারতবর্ষে যে পরিমাণ তেল এবং গ্যাসের ব্যবহার হয়, সেই পরিমাণ তেল ও গ্যাসের উৎপাদন আমাদের দেশে হয় না। তাই এই পরিস্থিতিতে এই দুইয়ের বিকল্প খোঁজাই আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলদায়ক হবে। প্রথম হচ্ছে সৌর উর্জ্জার উৎপাদন এবং পরমাণু বিদ্যুৎ উৎপাদনে মনোনিয়োগ করা। ভারতবর্ষ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্রে বিরাট উপলব্ধি হাসিল করেছে। গত বছরে ৪৫ গিগা ওয়াট সৌর উর্জ্জার ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে ভারত। আন্তর্জাতিক রিনিউয়েবল এনার্জি স্ট্যাটিসটিকস ২০২৬-এর রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষ বর্তমানে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তর সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী দেশ হয়েছে। যুদ্ধের পরিস্থিতিতে গ্যাসের অভাবকে মেটানোর জন্য মানুষ বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র উপকরণ, যেমন—ইন্ডাকশন ওভেন, মাইক্রোওভেন প্রভৃতি ব্যবহার করছে।

যেভাবে গৃহে বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র উপকরণ ব্যবহার বেড়েছে, ঠিক একইভাবে পেট্রোল ডিজেলের বাহনের পরিবর্তে বিকল্প হিসেবে বিদ্যুৎ চালিত বাহন ব্যবহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত ছয় বছরে দেশে প্রায় ৫০ লক্ষের অধিক বৈদ্যুতিক বাহনের পঞ্জীকরণ হয়েছে। সরকারও এই কাজে বিশেষ ছাড় দিয়েছে। পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে, ২০১৯-২০ খ্রিস্টাব্দে ১.৭৪ লক্ষ, ২০২১-২০২২-এ ৪.৫৯ লক্ষ, ২০২২-২০২৩-এ ১১.৮৩ লক্ষ, ২০২৩-২০২৪-এ ১৬.৮১ লক্ষ এবং ২০২৪-২০২৫-এ এই সংখ্যা বেড়ে ১৯.৬৮ লক্ষ হয়েছে। ভাবুন যদি এত পরিমান বাহন ইলেকট্রিক চালিত না হতো, তাহলে ক্রুড় ওয়েল কেনার জন্য ভারতকে কত পরিমাণ ডলার ব্যয় করতে হতো?

এর থেকেও গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে মোদি সরকার, যা সচরাচর মানুষ হয়তো দৃষ্টি রাখেন না। ২০১৪ খ্রিস্টাব্দের আগে ভারতবর্ষের রেলপথ মাত্র ২৪% বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছিল। গত ১২ বছরে মোদি সরকার প্রায় ৪৭ হাজার কিলোমিটার রেলপথকে সম্পূর্ণ বিদ্যুত যুক্ত করে তুলেছে, যা বাস্তবে ভারতের ডিজেল ব্যবহারের পরিমাণকে অনেকটাই কমিয়ে এনেছে। যুদ্ধের কারণে ক্রুড় অয়েলের আমদানি অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে, তাই বর্তমানে বোঝা যাচ্ছে ভারতের নেতৃত্বে কতটা সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি নিয়ে প্রগতির পথে চলেছেন। এছাড়া কেন্দ্র সরকার খুব তাড়াতাড়ি হাইড্রোজেন শক্তির দ্বারা চালিত ট্রেনের পরিচালনার জন্য গবেষণা শুরু করেছে। এছাড়া খুব তাড়াতাড়ি হাইড্রোজেন চালিত চার চাকার গাড়ি ভারতের সড়কে বা রাস্তায় চলতে দেখা যাবে। এর পরের পদক্ষেপ অনুসারে প্রধানমন্ত্রী সূর্য ঘর যোজনা নেওয়া হয়েছে। এই যোজনা অনুসারে গৃহস্থের বাড়ি কিংবা বিভিন্ন কার্যালয়ের ছাদে সৌর প্যানেল লাগানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে, আর্থিক মদত দেওয়া হচ্ছে। এই যোজনার ফলে একদিকে যেমন গৃহের বিদ্যুৎ খরচ সাশ্রয় হবে, তেমনি অন্যদিকে পরিবেশ দূষণও কম হবে পরিবর্তন সাধারণত ধীরগতিতেই হয়, যার প্রচেষ্টা সরকার করেছে এবং সমপরিমাণ প্রয়াস যদি সাধারণ মানুষ করে, তাহলে ভারতের বিকাশ কোন শক্তিই রুখতে পারবে না।

ভারতবর্ষের পরমাণু উর্জ্জার দ্বিতীয় চরণের আরম্ভের স্বরূপে প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রীডার রিয়াক্টর (PFBR)-এর সফল নির্মাণকে আন্তর্জাতিক পরমাণু উর্জ্জা এনার্জির (IAEA) মহা নির্দেশক রাফেল গ্রান্সী অত্যন্ত ভালো কাজ বলে অভিনন্দন জানিয়েছেন। তামিলনাড়ুর কলপক্কম স্থিত কারখানা দ্বারা প্রথমবার ক্রান্তিকতা অর্জিত দীর্ঘকালীন স্থিরতা এবং পরমাণু উর্জ্জার ফলে ভবিষ্যতে এক নির্ণায়ক পদক্ষেপ হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। দুই দশক ধরে গবেষণার দ্বারা নির্মিত ভারতের এই প্রোটোটাইপ ফাস্ট ব্রীডার রিয়াক্টর বিশ্বে দ্বিতীয় উৎপাদক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিতা লাভ করেছে। এর আগে কেবলমাত্র রাশিয়া এটি নির্মাণ করেছে। আমেরিকা এবং জাপান অনেক দশক আগে এই জটিল প্রক্রিয়ায় সফলতা না পেয়ে তাদের

গবেষণাকে স্থগিত করেছিল। আন্তর্জাতিক সংস্থা IAEA এই উপলব্ধি অর্জন করার জন্য ভারতের বৈজ্ঞানিকদের এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই বৈজ্ঞানিকরা আরম্ভিক ভৌতিক পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই প্রক্রিয়াকে বিদ্যুৎ গ্রীডের সঙ্গে জুড়ে দেবেন। এই পরমাণু রিয়াক্টারে প্লুটোনিয়াম আধারিত মিশ্রিত অক্সাইড এবং কুলেন্ট রূপে তরল সোডিয়ামের ব্যবহার হচ্ছে।

প্রদূষণ এবং গ্লোবাল ওয়ার্মিং-এখন দুইটি বিষয় যা প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে প্রত্যেক মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিক সভায় ২০৭০ পর্যন্ত নেট জিরো কার্বন নিঃসরণের কথা দিয়েছে। অথচ ভারতবর্ষ ২০৪৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিকশিত দেশ হওয়ার সংকল্প নিয়েছে। এই সংকল্প অর্জনের জন্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য একদিকে যেমন কল-কারখানা বাড়বে, লাখো সংখ্যায় গাড়ি বাড়বে, রাস্তাঘাট নির্মাণের জন্য গাছপালা কাটা হবে, তখন কিভাবে এই শূন্য কার্বন নিঃসরণ সংকল্প পালন হবে? এই বিষয়টিকে কার্যকর করার জন্য প্রথম হচ্ছে Renewable Energy। অর্থাৎ এমন বিদ্যুৎ নির্মাণ করা, যার দ্বারা দূষণ হবে না। যেমন—সৌর উর্জ্বা, পবন বিদ্যুৎ, পারমাণবিক বিদ্যুৎ, সমুদ্রের ঢেউ দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন ইত্যাদি। অন্যদিকে অধিক থেকে অধিক অক্সিজেন উৎপাদনকারী বৃক্ষরোপণ এবং সংরক্ষণ। বর্তমান সরকার এই উভয় ক্ষেত্রে বেশ ভালো কাজ করছে। অধুনা রিপোর্ট অনুসারে ২০২১ খ্রিস্টাব্দের পর ভারতবর্ষে ১৪৪৫ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল বৃদ্ধি হয়েছে। অর্থাৎ ভারতের ভৌগোলিক ক্ষেত্রের ২৫.১৭% হয়েছে। নবিনীকৃত উর্জ্বার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ২০৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াটের লক্ষ্যমাত্রা রেখেছে। ভারতবর্ষে বর্তমান (২০২৪ খ্রিস্টাব্দে) ৮,২৭,৩৫৭ বর্গ কিলোমিটার বনাঞ্চল ও বৃক্ষাঞ্চল আছে। এই বিষয়ে মধ্যপ্রদেশে সব থেকে বেশি অগ্রণী। এরপরে অরুণাচল, মহারাষ্ট্র, ছত্রিশগড়, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা, রাজস্থান, মিজোরাম, গুজরাট প্রভৃতি রাজ্য আছে। যদিও বড় শহরগুলোতে দূষণের সমস্যা অনেক বেশি। সেখানে জনসংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধির জন্য গৃহনির্মাণ এবং অন্যান্য সুবিধা অর্জনের জন্য বৃক্ষ ধ্বংস করা হচ্ছে, অথচ গাছ লাগানোর আগ্রহ খুব কম দেখা যায়। এই বিষয়টি অত্যন্ত চিন্তার। শহরের মানুষদের এই বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন হওয়া দরকার এবং রিন্যুয়েবল এনার্জির ব্যবহার বাড়ানো উচিত। ■

বীর শিরোমণি মহারানা প্রতাপ

রাজকুমারী মাহেশ্বরী

মহারানা উদয় সিংহ ও মহারানী জয়বন্তা বাঈর গৃহে ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দের ৯ই মে কুম্মহল গড় কেল্লায় মহারানা প্রতাপের জন্ম হয়। ওঁনাকে অস্ত্রশস্ত্র চালানোর শিক্ষা দেন জয়মাল মেড়েতীয়া। কিশোর অবস্থা থেকেই ওঁনার মধ্যে উচ্চ-নিম্ন বর্ণের কোন ভেদাভেদ ছিল না। তিনি ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত রণকুশলী হওয়ার পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে আকবর চিতৌর আক্রমণ করে। ৬ মাস ধরে ভয়ংকর যুদ্ধ হয় এবং সেখানে জয়মাল এবং ফতা সিংহ খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, কিন্তু পরাজয়ের সম্মুখীন হন। দুর্গের মধ্যে রাজপুত নারীরা বিধর্মীদের অত্যাচার থেকে বাঁচবার জন্য অগ্নি সমাধি জহরব্রত পালন করে প্রাণের আহুতি দেন, যা ছিল চিতোরের অন্তিম জহরব্রত। আকবরের সেনা চিতোরে প্রবেশ করে লুটপাট করে এবং সাধারণ নারীদের ওপর অমানবিক অত্যাচার করে। প্রায় ৩০ হাজার মানুষ সেই যুদ্ধে মারা যান। তখন মহারানা উদয় সিং মেবারের রানা ছিলেন। ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে উদয় সিং মারা যাওয়ার পর, রানা প্রতাপের রাজ্যাভিষেক হয়। সম্পূর্ণ বিপরীত পরিস্থিতির মধ্যে পড়েন রানাপ্রতাপ। দেশের বিভিন্ন অংশের ছোট-বড় জায়গীরদার রাজারা আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু মেবারের মানুষ আকবরের অধীনস্থতা স্বীকার করেননি। এই কারণে আকবর মাঝে মাঝেই সেনা পাঠিয়ে মেবারের রানা প্রতাপকে দুর্বল করার জন্য আক্রমণ চালাতেন। কিন্তু প্রতিবারই লুটপাট করে আকবরের সেনা ফিরে যেত। এইসব কারণে প্রতাপকে তাঁর পরিবার সহ জঙ্গলে চলে যেতে হল। শত কষ্টের মধ্যেও রানা প্রতাপ আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেননি।

ঠিক এমন পরিস্থিতিতে উদয় সিং-এর একজন দরবারী ভামাশাহ প্রতাপের সমর্থনে এগিয়ে আসেন, তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ নিয়ে। এই দানবীর ভামাশাহের জন্ম বর্তমান পালী জেলার সাদড়ি গ্রামে এক জৈন আশওয়াল পরিবারে ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে জুন হয়েছিল। ওঁনার পিতা ভারমাল রণথম্বর কিল্লার জায়গীরদার ছিলেন। মাতৃভূমির রক্ষার জন্য ভামাশাহ তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দান করেছিলেন। যার পরিমান এত ছিল যে, ২৫ হাজার সেনাকে ১২ বছর পর্যন্ত নির্বাহ করা যেতে পারে। ওঁনার এই দানশীলতাকে সম্মান জানানোর জন্য আজও রাজস্থানে কোন দানবান ব্যক্তিকে তাঁর দানশীলতার জন্য, ভামাশাহ পুরস্কার দেওয়া হয়। ভামাশাহ-এর এই সহযোগীর ফলে রানা প্রতাপ পুনরায় নতুন উৎসাহের সঙ্গে সেনাবাহিনী নির্মাণ করেন এবং মুঘল শাসনের হাত থেকে মেবারকে স্বাধীন করেন। ভামাশাহের দানশীলতার জন্য কবি লিখেছেন—

ওহয় ধন্য দেশ কি মাটি হ্যা, জিশমে
ভামাশাহ সা লাল পলা।
উস দানবীর কি যশ গাঁথা কো মেট
সকা ক্যায় কাল ভলা।।

ভামাশাহের দেশভক্তি দেখে ওঁনার পুত্র জীবাশাহকে রানাপ্রতাপ-এর পুত্র অমর সিংহ তাঁকে মন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। জীবাশাহের পুত্র অক্ষয়রাজকে অমর সিংহ পুত্র কর্ণসিং তাঁর মন্ত্রী রূপে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। অর্থাৎ তিনটি বংশ পরম্পরা ধরে ওঁনার পরিবারকে সম্মান জানানো হয়েছিল।

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে ২৪শে জুন হলদিঘাটের সমর ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গরমে সকাল ৮টায় রাজপুত সেনা এবং মুঘল সেনাদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম ১ ঘন্টাতেই মুঘল সেনারা পিছু হাটতে শুরু করে, কারণ দুই পক্ষ থেকেই রাজপুতরা যুদ্ধ করেছিলেন। মুসলিম সেনা বুঝতেই পারছিল না, যে কে তাদের দলের আর কে রানার দলের? তখন মুঘল সেনার একজন বললেন, যাকে সামনে পাও তাকেই মারো, কারণ মরবে তো কাফেরই। পরিস্থিতি প্রচণ্ড গম্ভীর হয়ে দাঁড়ালে একসময় মহারানা প্রতাপ অনেক সেনার দ্বারাবেষ্টিত হয়ে পড়লেন। তখন বড়সাদবীর ঝালামন সিং এবং হাকিমখাঁ-র মিলে রানা প্রতাপকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে বলে স্থির করলেন। অনেক অনুনয় বিনয় করার পর রানা প্রতাপকে যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে সরানো হল। কিন্তু রানার মুকুট পড়ে ঝালামন, যাকে রানা প্রতাপের মতোই দেখতে লাগছিল, তিনি যুদ্ধ করেন এবং প্রচণ্ড পরাক্রম দেখানোর পর তাঁর মৃত্যু হয়। যুদ্ধ অনির্ণিত হয় এবং মুঘল সেনারা ফিরে যায়।

এরপর মহারানার মৃত্যু হয়নি জেনে স্বয়ং আকবর ১৩ই অক্টোবর ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে সেনা নিয়ে গোগুণ্ডা আসেন। ৬ মাস ধরে মেবারের পাহাড়ের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে রানা প্রতাপের কোন সন্ধান না পেয়ে, ফিরে যান। ৬ ডিসেম্বর ১৫৮৪ খ্রিস্টাব্দে জগন্নাথ কাছাওয়ার নেতৃত্বে মুঘল সেনা আবার মেবার আক্রমণ করে। প্রায় ২ বছর ধরে গেরিলা যুদ্ধ হয়, কিন্তু কোন ফলপ্রসূ না হওয়ায় ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সেনারা ফিরে যায়। ১৫৭৬ থেকে ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ, ১০ বছর ধরে মুঘলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন মহারানা প্রতাপ। তারপর ১৫৮৬ থেকে ১৫৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বীর শিরোমনি মহারানা প্রতাপ চাওন্ড নামক স্থলে এক রাজধানী বানিয়ে শাসন কার্য করেন। রানা প্রতাপের নাম রাজপুতানার ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে এবং আগামী প্রজন্ম অত্যন্ত গৌরবের সঙ্গে তাঁর বিজয়গাথাকে পড়ে অনুপ্রাণিত হবে। ■

পরিষদ বার্তা

লাভ জেহাদের বিরুদ্ধে ব্যারাকপুরে বিক্ষোভ প্রদর্শন

মহারাষ্ট্র নাসিকে T.C.S - B.P.O-তে লাভ জেহাদ এবং জোরপূর্বক হিন্দু মহিলাদের শারীরিক নির্যাতন, ধর্ষণ ও জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে। এছাড়াও আমাদের দেশে এবং আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও এই রকম বহু জায়গায় আমাদের হিন্দু বাড়ির মেয়েরা লাভ জেহাদের শিকার হচ্ছে। পরবর্তীতে তাদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে সেই ভিডিও সমাজের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে ব্লাকমেইল করছে। তারই প্রতিবাদে ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ/বজরঙ্গ দলের বিক্ষোভ প্রদর্শন কর্মসূচি ব্যারাকপুরে।

মহিলা শক্তির নারীবন্দন বিল পিছিয়ে দিল ওঁরা

ড. জয়ন্ত বিশ্বাস

ভারতবর্ষে আদিকাল থেকেই মাতৃশক্তির বন্দনা করা হয়। এখানে বিদ্যার জন্য মাতা সরস্বতী, সুখ-সম্পদের জন্য মাতা লক্ষ্মী এবং শক্তির জন্য মাতা দুর্গার উপাসনা করার বিধান আছে। শক্তির অভাবে শিবও শবের সমান। পৃথিবীকে আমরা মাতা বলে থাকি এবং আমার মা ভবানীর উপাসনা করতে গিয়ে ভারত মাতাকে জগৎ জননী মানি। আমাদের এখানে পিতৃভূমির নয়, মাতৃভূমির আরাধনা করা হয়। শ্রীরামের পূর্বে সীতা মাতাকে স্মরণ করা হয়, সীতারাম সীতারাম এর জপ করি। আমরা স্ত্রীকে মাতৃশক্তির প্রতীক মেনে এবং বিশ্বাস করে সমগ্র জীবন চালনা করি। আমরা যে কোন ঋণ থেকে উদ্ধার হতে পারি, কিন্তু মাতৃঋণ কখনোই পরিশোধ করতে সমর্থ্যবান হই না। অথচ সনাতনী ধর্ম ছাড়া অন্য সব ধর্মে স্ত্রীকে পর্দানশীল বা সন্তান উৎপাদনের ভূমি ভেবে আচরণ করা হয়, যা বাস্তবে নারী জাতির অপমান ছাড়া আর কিছুই না।

সাধারণত আমাদের দেশে নারী শক্তির বর্ণনার সময় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী কিংবা গুজরাট থেকে গৌহাটি পর্যন্ত ক্ষেত্রের মহিলাদের বিষয়েই আলোচনার সূত্রপাত ঘটে। যেমন—রানী কর্ণাবতী, রানী দুর্গাবতী, রানী অহীল্লা বাঈ, রানি লক্ষ্মীবাঈ, রানী কন্যাগী, রানী চেন্নমা, রানী অব্যার আদিদের নাম। ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে নারী শক্তি এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে মহিলা নেতৃত্বের অসাধারণ পরম্পরা স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৮টি প্রদেশের (যেমন—আসাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল, মিজোরাম, ত্রিপুরা এবং সিকিম) নতুন নামকরণ করেছেন অষ্টলক্ষ্মী। এই আটটি প্রদেশের প্রায় ৫০০০ কিলোমিটার অধিক সীমা পাঁচটি দেশের সঙ্গে (নেপাল, ভুটান, তিব্বত বা চীন, বাংলাদেশ, মায়ানমার) জুড়ে আছে। এই অঞ্চলগুলো শেষ দেশের সঙ্গে মাত্র ২২ কিলোমিটার সরু পথ, যাকে শিলিগুড়ি করিডর কিংবা চিকেন নেক বলা হয়, তার মারফত সম্পর্কিত আছে। অধিকাংশ প্রদেশ জনজাতি বহুল কিন্তু সম্পূর্ণ দেশের গড় সাক্ষরতার নিরিখে পূর্বতর রাজ্যের প্রদেশেরগুলোর গড় অনেক বেশি। এই সমস্ত প্রদেশগুলোর আর্থিক ব্যবস্থা মহিলাদের উপর বেশি নির্ভরশীল। এখানে পণপ্রথা কিংবা মহিলা উৎপীড়ন সমস্যাগুলো খুব একটা দেখা যায় না। শুধু তাই না, এই অঞ্চলের প্রায় ২ কোটি মহিলাদের নেতৃত্বে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খেলাধুলা, ব্যবসা, সরকারি চাকরি প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। এছাড়া আতিথ্য পরিষেবা যেমন—বিমান পরিচারিকা, চিকিৎসা সহায়ক, রিসেপশন সেবা প্রভৃতির জগতে এই ক্ষেত্রের মহিলাদের মেধা ও আত্মবিশ্বাস ভারতের যে কোন প্রান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে সক্ষম। আবার মেঘালয়ের খাসি সমাজ তো মাতৃসত্তাকে সম্মান করে চলে। সেখানে মেয়েদের বিবাহের পর তার বাবার বাড়িতেই থাকতে হয় এবং পাত্র অর্থাৎ বরকে শ্বশুরবাড়িতে থাকতে হয়। শিশুর নামের সঙ্গে মাতার জাতি যুক্ত করা হয়। আসামে বোড়ো, দিমাশাকাছরীর মতো জনজাতিরাও মাতার নেতৃত্বে বড় হয়।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধে (১ বছর ধরে) মাত্র ১৬ বছর বয়সী নাগা যোদ্ধা গাইদিল্যুর নেতৃত্বে ইংরেজদের ১ লাখ সেনাকে নাস্তানাবুদ করা হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে একজন দেশদ্রোহীর সাহায্যে ওঁনাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। জহরলাল নেহরু ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে গাইদিল্যুর সঙ্গে দেখা করতে শিলং জেলে যান এবং ওঁনাকে রানির উপাধি প্রদান করেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ওনাকে তাম্রপত্র প্রদান করা হয় এবং অটল বিহারীর সময় ওনার নামে বীরত্বের পুরস্কার ঘোষণা করা হয় এবং ডাকটিকিট জারি করা হয়। তারপর রানী গাইদিল্যু বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের সভাপতি রূপে কাজ করেন এবং বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে খ্রিস্টানদের দ্বারা ধর্ম পরিবর্তনের বিরোধিতা শুরু করেন। এছাড়াও ওই অঞ্চলের নক্ষত্র সমান নারীদের নাম জানা দরকার। যেমন—যোগাম গামলিন, ঘিসাঙ্গবাঙচুক, ডেলিনা ঘোমডুপ, বিনালক্ষী নেপরাম, তেমশুলা আয়ো, সাইকো মীরাবাঈ চানু, পেট্রিশিয়া মুখিম, অংশু জামসেপা, রিমা দাশ, মেরিকম, ইলাম ইন্দিরা দেবী, দর্শনা ঝাবেরী প্রমুখ। এঁনারা সবাই ভারতবর্ষের নামকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। দেশের বুদ্ধিজীবীদের এবং বিদ্যালয়গুলোকে এমন ভারতীয়

মহান নারীদের নামের সঙ্গে সকলকে পরিচিত করানোর দরকার এবং বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে স্থান দেওয়া দরকার।

ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দে সংসদে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ আইন পেশ করেছিলেন। যা কংগ্রেস তথা ইউ.পি.এ সরকার দীর্ঘদিন ধরে দেশ শাসন করলেও লোকসভা ও বিধানসভায় মহিলাদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করাতে পারেনি। তবে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের জনগণনার ভিত্তিতে আসন পুনর্বিন্যাসের পর তা কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছিল সেই বিলে। এবং ২০৩৪ খ্রিস্টাব্দের লোকসভা নির্বাচনে এই সংরক্ষণ কার্যকর হবে। কিন্তু এই সংরক্ষণকে ২০২৯ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে কার্যকরী করার জন্য গত ১৬ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার ২০২৩ খ্রিস্টাব্দের ওই আইনকে সংশোধন করতে উদ্যোগী হয়ে ১৩১তম সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভায় আনে বি.জে.পি তথা এন.ডি.এ সরকার। কিন্তু কংগ্রেস, টি.এম.সি, সমাজবাদী পার্টি, ডি.এম.কে সহ বিরোধীরা বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় তা আটকে গেল। উপস্থিত সদস্যদের দুই তৃতীয়াংশের সমর্থন না পাওয়ায় তা পাস হল না। অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ বিলটিকে সমর্থন করার জন্য বিরোধীদের কাছে আবেদন জানিয়েছিল। এই বিল পাস হলে সমস্ত লোকসভার আসন সংখ্যা বেড়ে হতো ৮৫০। সমস্ত রাজ্যে সমানুপাত হারে আসন বাড়তো। এক-তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত হলে লোকসভায় অনেক বেশি মহিলা প্রতিনিধির অংশগ্রহণ দেখা যেত। কিন্তু বিরোধীদের বাঁধায় মহিলাদের ক্ষমতায়নের এই প্রচেষ্টা ধাক্কা খেল। ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী এই বিরোধিতাকে ভ্রূণ হত্যার সমতুল্য পাপ বলে উল্লেখ করেছেন। কংগ্রেসকে সংস্কার বিরোধী বলে অভিহিত করেছেন। দেশের মা-বোনেরা বিরোধীদের কখনো ক্ষমা করবেন না। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন মহিলাদের সংরক্ষণ দেওয়ার প্রয়াস জারি থাকবে, ভবিষ্যতে আরো সুযোগ আসবে। অন্যদিকে বিরোধীরা এখন সাফাই গাইছেন, মহিলা সংরক্ষণ নিয়ে সমস্যা নেই। সমস্যা আসনগুলোর বিন্যাস নিয়ে। দেশে জনসংখ্যা প্রচুর বেড়েছে, সেই ভিত্তিতে আসন বাড়ানোর জন্য কেন্দ্র জানিয়েছিল, প্রত্যেক রাজ্যে ৫০% করে আসন বাড়বে। বাস্তবে এর ফলে মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ত। কিন্তু তাতে বাধা পড়লো বিরোধীদের নিহিত স্বার্থ দ্বারা।

২০১৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে নরেন্দ্র মোদির সরকার মহিলাদের আর্থিক ও সামাজিক রূপে সশক্ত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে চলেছে। ফলে নারী শক্তির সামাজিক অংশীদারী বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি। বিহারের গ্রাম পঞ্চায়েতে মহিলাদের ৫০ শতাংশ আসন সংরক্ষণ করেছে এন.ডি.এ সরকার এবং তার সুপরিণামও দেখা গেছে। বর্তমানে সম্পূর্ণ দেশ নারীদের রাজনৈতিক রূপে শক্তিমান করার প্রয়াস ছিল এই ১৩১তম সংবিধান সংশোধন। দেখা গেছে মহিলা সংসদদের সংসদে অংশগ্রহণের শতকরা হার পুরুষ সংসদদের চেয়ে বেশি। তাই প্রধানমন্ত্রী চেয়েছিলেন আগামী ২০২৯ খ্রিস্টাব্দের নির্বাচনে মহিলাদের জন্য ৩৩% আসন সংরক্ষণ করে নারী শক্তিকে দেশ গঠনের কাজে আরও বেশি এগিয়ে নিয়ে আসতে। যাই হোক দেশের এই মাতৃ দুর্গা সমাজ উচিত সময় উচিত বার্তা দেবেন এই বিরোধকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে।

'জয় মা দূর্গা।। জয় মা কালী।।' ■

জেলা প্রশিক্ষণ বর্গ, উত্তর-পূর্ব কলকাতা, দক্ষিণবঙ্গ

লালবাগ শহরে রামনবমীর শোভাযাত্রা, মধ্যবঙ্গ

সনাতন ধর্মকে বিনাশ করার জন্য নানা ধরনের ষড়যন্ত্র থেকে সাবধান থাকা দরকার

আদিত্য দেব

এতদিন বিধর্মীদের দ্বারা নানা ধরনের জিহাদের সংবাদ আমরা জেনেছি। যেমন—লাভ জিহাদ, হালাল জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ প্রভৃতি। কিন্তু বর্তমানে আর এক জিহাদের খবর কর্পোরেট জগতে সবার অজ্ঞাতে যেভাবে চলেছিল তা অত্যন্ত গম্ভীর পরিস্থিতির নির্মাণ করেছে। মহারাষ্ট্রের নাসিক শহরে অবস্থিত টি.সি.এস-এর অফিসে গত চার বছর ধরে লাভ জিহাদ এবং জবর ধর্মান্তর জিহাদ চুপচাপে চলছিল, তা প্রকাশিত হওয়ায় সকলেই হতবাক হয়ে গেছেন। টি.সি.এস নাসিকের বি.পি.ও ইউনিটে প্রায় ৩০০ জন কর্মী কর্মরত আছে, যার মধ্যে প্রায় ৪০ জন ইসলাম ধর্মী। সেখানকার এইচ.আর ম্যানেজার, যার নাম নিদা খান এবং ছজন টিম লিডার, যথা—দানিশ শেখ, তৌসিফ আখতার, রাজা মেমন, শাহরুখ কুরেশি, শাফি শেখ এবং আসিফ আনসারী, এই সাত জনে একত্রে হিন্দু মহিলা এবং যুবতীদের টার্গেট করে ব্রেন ওয়াশ করা, প্রলোভন দেওয়া, চাকরি হারানোর ভয় দেখিয়ে ধর্মান্তকরণ করার প্রয়াস করত। এই কাজের জন্য একটি আলাদা হোয়াটস অ্যাপ গ্রুপ ছিল, যেখানে তারা পরবর্তী কোন হিন্দু মেয়েকে কিভাবে ফাঁসাবে তার পরিকল্পনা করত। অফিসের কাজের অজুহাতে রিসোর্ট বা ওয়াটার পার্কে নিয়ে গিয়ে তাদের ছবি তোলা, জোর করে শারীরিক ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা, গোপন ভিডিও করা কিংবা ছবি তোলা হতো। যা পরে ব্ল্যাকমেলের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। শারীরিক ও মানসিক শোষণের পর শুরু হতো ধর্মীয় পর্যায়ে চাপ সৃষ্টি করা। অফিসের মধ্যে রোজা রাখতে, নামাজ পড়তে বাধ্য করা হতো, নিষিদ্ধ মাংস খেতে বাধ্য করা হতো। এই সব কিছুর বিনিময়ে প্রমোশন ও বেতন বৃদ্ধির প্রলোভন থাকতো। এছাড়া হিন্দু দেব-দেবীকে নিয়ে অবমাননাকর মন্তব্য করা এবং হিন্দু ধর্মীয় প্রতীক ব্যবহার করা এবং হিন্দু আচার-আচরণের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ করা হতো। এই কাজে এইচ.আর ম্যানেজার যুক্ত থাকার অভিযোগ জানালেও প্রতিবারই তা ধামাচাপা দেওয়া হতো। বাস্তবে এইসব ঘটনাগুলো শুধু ব্যক্তিগত অপরাধ নয় বরং একটি সু-পরিকল্পিত সাংগঠনিক ষড়যন্ত্র ছিল।

এই ঘটনা হয়তো প্রকাশিত হতো না, কিন্তু একটি পরিবার জাগরুক ছিল। তারা দেখল যে তাদের আধুনিকতার মানসিকতা সম্পন্ন মেয়ের মধ্যে হঠাৎই অদ্ভুত পরিবর্তন চলে এসেছে। তার পোশাকে অদ্ভুত পরিবর্তন, হিন্দু আচার অনুষ্ঠান থেকে সরে যাওয়া, পুরাতন বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, রোজা রাখা শুরু করা, এইসব দেখে পরিবারের সদস্যদের মনে সন্দেহ উৎপন্ন হয়। পরিবারের চাপে সেই যুবতী পুলিশকে এই বিষয়ে অভিযোগ দায়ের করে। এই অভিযোগ আগেও পুলিশের কাছে (৬টি অভিযোগ) এসেছিল, কিন্তু কোন প্রমাণ না থাকায় পুলিশ কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি।

এই অভিযোগকে ভিত্তি করে পুলিশ সাতজন আন্ডার কভার পুলিশ কর্মীকে অফিসের মধ্যে চাকরি করার আড়ালে পাঠায়। প্রায় ৪০টি স্থানে সি.সি.টিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করে সেখানে অনুপোযুক্ত আচরণের প্রমাণ তারা পায়। এ.সি.পি ক্রাইম শ্রীসন্দীপ মিটকের নেতৃত্বে এস.আই.টি গঠন করা হয় এবং পীড়িতদের (প্রায় ৫০ জন) মুখ খোলাতে সক্ষম হন পুলিশ। যদিও এই ঘটনার পর টি.সি.এস কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত সকলকে সাসপেন্ড করে এবং টাটা সন্সের চেয়ারম্যান ঘটনাটিকে উদ্বেগজনক বলে মন্তব্য করেছেন। মহারাষ্ট্রের মন্ত্রী নিতিশ রানে এটিকে কর্পোরেট জিহাদের আখ্যা দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন, এই ঘটনায় দোষীদের আইন মাফিক কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। বাস্তবে এটি ছিল দীর্ঘমেয়াদী, সাংগঠনিক, সিস্টেমেটিক ধর্মান্তরণ, ক্যারিয়ারের লোভ, ব্ল্যাকমেইল, এইচ.আর-কে দিয়ে অভিযোগ দমন করানোর নীতির মাধ্যম। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে, মানসিকতার মধ্যে জেহাদি ভাব থাকলে শিক্ষিত হলেও তা দূর হয় না, বরং ষড়যন্ত্র আরও ফলপ্রসূ হয়।

ফরিদাবাদের আল ফলাহ ইউনিভার্সিটির ডাক্তারির ছাত্র এবং পরিচালকদের মধ্যে আতঙ্কবাদী মানসিকতার ফলে দিল্লিতে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল। ইসলামের যারা ভালো চান, তাদের ভাবা উচিত এই ধরনের জিহাদদের জন্য তাদের মাজহবের কতটা ক্ষতি হচ্ছে? নিজে নিজের ধর্ম পালন করার অধিকার সবার আছে, কিন্তু অন্য কাউকে প্রভাবিত করে ধর্মান্তরিত করা একটি জঘন্য অপরাধ। সরকারকেও এমন জিহাদিদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য শক্ত আইন নির্মাণ করা উচিত। এই একই ধরনের ঘটনার বিবরণ এসেছে মুম্বাই শহরের টেক মহেন্দ্রা নামক কোম্পানির অফিসে। সেখানকার এক মহিলা কর্মচারী এক বেনামী চিঠি পাঠিয়েছেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বজরং দলের

অফিসে। বলা হয়েছে সেখানে হিন্দু মহিলাদের কিংবা পুরুষদের কোন প্রমোশন দেওয়া হয় না, কিংবা পূজা পার্বণের ছুটি পর্যন্ত দেওয়া হয় না। বজরং দলের নেতা গৌতম এই ঘটনাটির বিরোধিতা করে সেখানে গিয়ে প্রতিবাদ পত্র দিয়ে এসেছেন এবং ঘটনার তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়েছেন। টেক মহেন্দ্রা একটি বি.পি.ও কোম্পানি, সেখানে ৬০ শতাংশ মুসলমানরা কাজ করেন। রমজান কিংবা ইসলামিক পর্বে ওদের ছুটি দেওয়া হয়, কিংবা চার ঘন্টা কাজের সময় কমিয়ে দেওয়া হয়, কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে সেটা করা হয় না। এই বিভেদ জনক নীতি ভারতীয় সংবিধানের ধারা ১৪/১৫ এবং ২১ লঙ্ঘন করে বলে বজরং দল এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। এছাড়া জানা গেছে সেই অফিসের মুসলমান ছেলেদের, হিন্দু মহিলা বন্ধুদের বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়, কিন্তু অন্যদের তা দেওয়া হয় না। ভাবা দরকার এই ধরনের বড় কোম্পানিগুলোতে ধর্মের নামে যে অপরাধ চলছে তার কিন্তু কোন টের পাওয়া যায় না, এর কারণ কি? কারণ হয়তো, হিন্দুরা নিজেদের অত্যন্ত উদারবাদী মনে করে, সবকিছু এড়িয়ে যেতে চান। একজন মহাপুরুষ বলেছিলেন, অন্যায় দেখে প্রতিবাদ করা, প্রতিকার করা এবং প্রয়োজনে সংঘর্ষ করা হিন্দু সমাজের দরকার—এই বিষয়টি ভাবা দরকার।

সম্প্রতি লেন্সকার্ট নামের জনপ্রিয় চশমা বিক্রেতা কোম্পানির পক্ষ থেকে জারি করা স্টাইল গাইড অনলাইনে প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে দোকানের কর্মচারীরা হিজাব বা পাগড়ি পড়তে পারবেন, কিন্তু কপালে টিপ বা তিলক লাগাতে পারবেন না। এমনকি হাতে রক্ষা সূত্র বা কলাওয়া পরতেও পারবেন না। এই কোম্পানি পৃথিবীর ৫৪টা দেশে ব্যবসা করে এবং মালিক একজন হিন্দু। কিন্তু নিজেকে সেকুলার দেখানোর জন্য এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন বলে মনে করা হয়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পক্ষ থেকে এই অগণতান্ত্রিক গাইড লাইনের জন্য প্রতিবাদ জানানোর পর, কোম্পানির পক্ষ থেকে পীযূষ বনসল দুঃখ প্রকাশ করে, এই গাইডলাইন তুলে দেওয়ার জন্য সম্মত হয়েছেন। বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি হিন্দুরা সব সময়ই ষড়যন্ত্রের শিকার হচ্ছে, অথচ নির্বিকার ভাবে সব মেনে নিচ্ছে। এ সবের শেষ হওয়া দরকার।

সবকিছু দেখে মনে হচ্ছে, ভারতবর্ষে খুব সংগঠিতভাবে এবং নিঃশব্দে গাজোয়া হিন্দ চলছে। গাজোয়া একটি আরবি শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে জোর করে কিংবা লড়াই করে দখল করে নেওয়া। গাজোয়া হিন্দ মানে জোর করে কিংবা কৌশলে হিন্দুস্থান দখল করে নেওয়া। এটি ইসলামের একটি বিধান, ধর্মের নামে যুদ্ধ করা, প্রলোভনের দ্বারা কিংবা অন্য যে কোন পন্থা অবলম্বন করে হিন্দুদের ধর্মান্তরিত করে মুসলিম সংখ্যা বৃদ্ধি করে জনবিন্যাস পাল্টে সেই দেশ দখল করা। মুসলিম বালকদের শেখানো হয়, এই পৃথিবীকে কাফেরদের হাত থেকে মুক্ত করে আল্লাহর অনুগামীদের অধীনে আনতে হবে। অন্যদিকে হিন্দুরা বলে থাকেন 'বসুধৈব কুটুম্বকম', কিন্তু বিধর্মীরা তা মনে করেন না। উদারতার একটি ভালো গুণ, কিন্তু সাবধানতার সাথেই হওয়া উচিত।

ভারতবর্ষে ধর্মান্তকরণ করার জন্য বিদেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা স্বয়ংসেবী সংগঠন অর্থাৎ এন.জি.ও-র মাধ্যমে আসে আদিবাসী কল্যাণের নামে, কিংবা স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার নামে এই টাকা আসে। অথচ কোন ইসলামিক দেশে কিংবা সুদানের মত গরিব দেশে এই সাহায্য রাশি কেন পাঠান না সেইসব দানবীররা? ভারতের মুসলিম সংগঠনকে কেন আর্থিক সাহায্য পাঠান তারা? ভারতের হিন্দু বিরোধী কিংবা দেশবিরোধী সংগঠনগুলো সেবার আড়ালে প্রাপ্ত রাশি দিয়ে CAA এর বিরোধিতায় শাহীনবাগ প্রদর্শন, কিষাণ আন্দোলন, এন.আর.সি বিরোধে দাঙ্গা, লাভ জিহাদ প্রভৃতি কাজ করে থাকেন। এই সব দেশবিরোধী কাজকে রুখবার জন্য গত ৬ বছরে কেন্দ্র সরকার ২২ হাজারের বেশি এন.জি.ও-র পঞ্জিকরণ বাতিল করেছে। বর্তমানে সরকার সংসদে বিদেশি চাঁদা (বিনিয়ম) সংশোধন বিল পেশ করেছে। এর ফলে লোকসেবক, যেমন—এম.এল.এ, এম.পি কিংবা সরকারি কর্মচারী কেউই বিদেশ থেকে চাঁদা গ্রহণ করতে পারবেন না। আবার বলা হয়েছে, কোন এন.জি.ও বিদেশ থেকে প্রাপ্ত অর্থ অন্য কোন এন.জি.ও-কে অর্থ দিতে পারবে না। এমনকি এন.জি.ও তার প্রশাসনিক কাজের জন্য প্রাপ্ত ধন-রাশির মাত্র ২০% খরচ করতে পারবে, যা আগে ৫০% ছিল। এইসব পদক্ষেপের ফলে ভবিষ্যতে এন.জি.ও মারফত ধর্মান্তকরণ এবং দেশবিরোধী কাজের উপর লাগাম আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

সনাতনীদের সতর্ক থাকা দরকার, কারণ বিধর্মীরা ষড়যন্ত্রের কৌশল কায়দার মধ্যে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন আনছে। ছলে বলে কৌশলে ধর্মান্তরণ করিয়ে জনসংখ্যা বিন্যাসকে পরিবর্তিত করে, সনাতন ধর্মকে বিনাশ করার ষড়যন্ত্র করে গাজোয়া হিন্দ করতে চাইছে তারা। সতর্ক এবং সাবধানতা অবলম্বন করার সময় এসেছে এবার সকলের। ■

দেশের প্রতি আস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক

পারমিতা পাল

ইরানের সাথে ইজরাইলে এবং আমেরিকার যুদ্ধ চলছে। এই আবহে ভারতবর্ষের সঙ্গে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ক্রুড় ওয়েল এবং এলপিজি-র সংকট উৎপন্ন হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়াসে পেট্রোল ও ডিজেলের অভাব দেখা দেয়নি কিংবা মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি। উপরন্তু পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশকেও জ্বালানি তেল সরবরাহ করেছে ভারত। ভারতবর্ষের কুশল বিদেশ নীতির ফলে ভারতীয় তেল ও গ্যাসবাহী জলযান হরমুজ স্টেট পার করে ভারতে পৌঁছেছে। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকায় অবমূল্যায়ন হয়েছে। তবুও কেন্দ্র সরকার জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি রোধ করেছে। অথচ বিশ্বের অন্য দেশে তেলের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে আমরা এও দেখেছি, যখনি কোন মুসলিম দেশের উপর আক্রমণ হয়, তখনই ভারতবর্ষে বিদ্যুৎগতিতে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। পাকিস্তান, বাংলাদেশ যেহেতু প্রতিবেশী দেশ, হয়তো বা সেই প্রতিক্রিয়া খানিকটা হলেও স্বাভাবিক বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে গাজা, প্যালেস্টাইন, ইরানের উপর আমেরিকার আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই 'ইসলাম খতরেমে হ্যাঁ' বলে ভারতের মুসলিম সমাজ পোস্টার ব্যানার নিয়ে প্রদর্শনে রাস্তায় নেমে পড়ে। মজার ব্যাপারটা হচ্ছে, যেহেতু ইরান শিয়া মুসলিমদের দেশ, তাই ভারতের শিয়ারা তার বিরোধ প্রদর্শন করছে, কিন্তু বাকিরা চুপ করে আছে। এদের মধ্যে কাশ্মীরি মুসলমানরা প্রদর্শনে সবার আগে আছেই, সঙ্গে সঙ্গে ওখানকার মুসলিম মহিলারা তাদের গয়না, তামা-পিতলের বাসন, জমানো পুঁজি, বাচ্চাদের পিগি ব্যাঙ্ক ভেঙে অর্থ দান করেছেন ইরানের মুসলিমদের সাহায্য করার জন্য। সমস্ত অর্থ তারা (আনুমানিক ৫০০ কোটি) দিল্লিতে ইরানের দূতাবাসে পৌঁছে দিয়েছে। এই মানবিকতার অপর আরেকটি দিক তুলে ধরছি-৩০ বছর আগে কাশ্মীরের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের ওপর অকথ্য অত্যাচারের কাহিনি আমরা জানি। তখন সেখানে বলা হয়েছিল, বাড়ির মহিলাদের ছেড়ে পুরুষরা যেন কাশ্মীর থেকে চলে যায়। যারা তা স্বীকার করেনি তাদেরকে হত্যা করা, বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া, মেয়েদের ধর্ষণ করা এবং জীবন্ত মানুষকে কাঠ চিরার মতো করে কেটে দেওয়া হয়েছিল। কাশ্মীরে আজও অনেক মানুষ আছেন, যারা পণ্ডিতদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া বাড়িতে বাস করে এবং তাদের জমিতে চাষ করে। অর্থাৎ সেই সময় মানবিকতা জাগ্রত হয়নি তাদের।

গত ২২ এপ্রিল ২০২৫ কাশ্মীরের পহেলগাওয়ের বৈসরণ উপত্যকায় পাকিস্তান মদতপুষ্ট জাতি অর্থাৎ জঙ্গিরা নির্বিচারে ধর্ম জিজ্ঞাসা করে বেছে বেছে (২৫+১=) ২৬ জন হিন্দুকে হত্যা করেছিল। স্বজন হারাদের কান্নায় সেদিনকে পহেলগাওয়ের বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল। যদিও পরে ভারত সরকার 'অপারেশন সিন্দুর' চালিয়ে পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে অবস্থিত জঙ্গি ঘাটিগুলো গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। এই ঘটনার ফলে কাশ্মীরের পর্যটন শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে ভেবে, স্থানীয় বাসিন্দারা তাই প্রতিবাদে মোমবাতি জ্বালিয়ে রাস্তায় নেমেছিল। কিন্তু সেই পর্যন্তই শেষ। অথচ ইরানের ঘটনায় কাশ্মীরিরা আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু সেদিন তা কেন করেনি? কিংবা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযানে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেননি কেন তারা? অথচ পর্যটনের উপর কাশ্মীরের বহু মানুষের রুজি রুটি নির্ভর করে। সেই সময় এই মানবিকতা বোধ জাগ্রত হয়নি, কেন?

কথায় আছে 'ভগবানের ঘরে দেরী আছে, কিন্তু অন্ধকার নেই।' এই বাক্য প্রমাণিত হয়েছে। নিয়তির খেলা দেখুন, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের রক্তরঞ্জিত এই ৫০০ কোটি টাকা কিন্তু ইরান তাদের দেশে নিয়ে যেতে পারেনি। কারণ রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ম অনুসারে বিদেশে টাকা পাঠানোর জন্য, আগে তা যেখান থেকে অর্জিত হয়েছে, তার প্রমাণ দেওয়া জরুরি। আবার একবার ইরানকে দেওয়া অর্থ ফেরতও করা হবে না। মনে হয় এইবার কাশ্মীরের মুসলমানরা বুঝতে পারবেন, যে অর্জিত অর্থ হারানোর কষ্ট কতখানি? যেমনটা কাশ্মীরের পণ্ডিতরা পেয়েছিলেন, ভিটেমাটি হারিয়ে। যাই হোক, ইরানের দূতাবাস এই অর্জিত অর্থে ওষুধ কেনার প্রার্থনা জানিয়েছেন এবং তা কিনেওছিল। কিন্তু সেখানেও ভগবানের মার খেল তারা।

যে বিমানে ওষুধ যাওয়ার কথা ছিল, সেই বিমান বোমার আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গিয়েছে।

আমরা ইতিহাসে পড়েছি, ভারতবর্ষে ইসলামিক আক্রমণ ৮০০ বছর আগে হয়েছিল। অর্থাৎ তার আগে ভারতে ইসলাম ধর্মাবলম্বী ছিল না। ইসলামিক আক্রমণকারীদের দ্বারা জোর করে সাধারণ মানুষের ধর্মান্তকরণ করা হয়েছিল। কিংবা মহিলাদের ধর্ষণ করে গর্ভবতী করা হয়েছিল। তারপর থেকেই মুসলিমদের জাতি নির্মাণ হয়েছিল ভারতে। অর্থাৎ বেশিরভাগ বর্তমান মুসলমানদের পূর্বপুরুষরা হিন্দুই ছিল। ইংরেজরা ভারতবর্ষকে দ্বি-জাতি তত্ত্বের নিকেশে খণ্ডিত করেছিল। যে সমস্ত মুসলমানরা সেই সময় ভারতে স্বেচ্ছায় থেকে গিয়েছিল, তারা কিন্তু ভারতবর্ষের নাগরিক। ভারতের নাগরিক হিসেবে সমস্ত সুখ-সুবিধা, ভোট দেওয়ার অধিকার সবই ভারতবর্ষ থেকে তারা পায়। কিন্তু বিভিন্ন সময়ে তাদের আস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। যেমন—ভারত-পাকিস্তানের ক্রিকেট খেলার সময় কিংবা ওই দেশগুলোতে হিন্দুদের অত্যাচারের সময় নিরুত্তাপ থাকার জন্য। প্রশ্ন ওঠে দেশের নাগরিক হয়েও 'বন্দেমাতরম' গাইতে চান না কেন? কিংবা 'ভারতমাতা কি জয়' কেন বলতে চান না? পৃথিবীর অন্য কোন মুসলিম দেশে আক্রমণ হলে তাদের মন কেন কাঁদে? অথচ অপারেশন সিন্দুর কিংবা ভারত-পাক যুদ্ধের সময় তারা কেন মুসলিম ব্রাদারহুডের কাছে প্রশ্ন তোলেন না? ভারতীয় মুসলমানদের ভাবা দরকার, তা নইলে তাদের দেশের প্রতি আস্থা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক বলে মনে করি। ■

পরিষদ বার্তা

কলকাতার ভবানীপুরে শ্রীশ্রীভোলাগিরি আশ্রমে নিগ্রহের প্রতিবাদে পদযাত্রা

সম্প্রতি কলকাতার ভবানীপুরে শ্রীশ্রীভোলাগিরি আশ্রমে স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলর চড়াও হয়ে আশ্রমের গৈরিক বসনধারী সর্বস্ব ত্যাগী সন্ন্যাসীদের শারীরিক নিগ্রহ, অশ্রাব্য গালিগালাজ, চোর অপবাদ, হত্যার হুমকি ও মন্দিরের বিদ্যুৎ ও জল সরবরাহ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। তার প্রতিবাদে বিগত ১৯শে এপ্রিল ২০২৬-এর দুপুর দুটোয় ভারত সেবাশ্রম থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করা হয়। সেখানে ভবানীপুর থানায় গিয়ে একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয় এবং সে যাত্রা দিয়ে সমাপ্ত হয়, ভোলাগিরি আশ্রমে। দশনামি সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মোট মিশন আশ্রমের সাধু ও নাগা সাধুগণ এই প্রতিবাদ মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। নানা কারণে আজ সাধু সমাজ ধর্ম রক্ষা করার জন্য পথে নেমেছেন। জননী ও জন্মভূমিকে রক্ষা করার জন্য সাধুরা আজ এই কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন। এই বঙ্গভূমিকে জিহাদের হাত থেকে রক্ষা করতে আজ সন্ত সমাজ এক হয়ে লড়াই করছে। এই প্রতিবাদ সভার আয়োজক ছিলেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও কলকাতা মহানগর বঙ্গীয় সন্ত সমাজ। যাত্রাপথ বালিগঞ্জের ভারত সেবাশ্রম সংঘ থেকে শুরু হয়ে গড়িয়াহাট দেশপ্রিয় পার্ক রাসবিহারী কালীঘাট হাজরা, তারপরে ভবানীপুর থানায় গিয়ে ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয় এবং সেখান থেকে ভবানীপুর ভোলাগিরি আশ্রমে গিয়ে এই পদযাত্রা শেষ হয়।

কবিতীর্থ জেলায় রামনবমীতে সেবাকার্য ও জলছত্র, দক্ষিণবঙ্গ

গোপালী আশ্রমে রামনবমী পালন

সনাতনীদের সাইক্লোনে মমতা কুপোকাত

ড. রামানুজ গোস্বামী স্মৃতিতীর্থ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ বা আর.এস.এসের শতবর্ষ উদযাপনের কিছুদিন পরেই ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের পবিত্র জন্মভূমিতে হিন্দুত্ববাদী রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি দুই তৃতীয়াংশেরও বেশি বিধানসভা আসন দখল করে প্রথমবারের জন্য পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতায় এসেছে। নিঃসন্দেহে হিন্দুত্বের প্রবল সুনামির ফলেই এই জয় সম্ভব হয়েছে। এই বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই যে, পশ্চিমবঙ্গ আজ ভারতবিরোধী এবং হিন্দুবিরোধী শক্তিগুলোর কবল থেকে মুক্তিলাভ করেছে। যে উন্নত পশ্চিমবঙ্গের স্বপ্ন দেখেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ, তা বিজেপির হাত ধরে অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। পশ্চিমবঙ্গের জনক ভারতকেশরী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বর্গগত বিদেহী আত্মা এই বিপুল জয়ে নিশ্চিতভাবেই শান্তি পাবে। দুই শতাধিক আসনে বিপুল ভাবে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গে গঠিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী তথা হিন্দুত্ববাদী সরকার, যা এই রাজ্যের ইতিহাসে তথা স্বাধীনতার পরে এই প্রথম। নিঃসন্দেহে এই জয় এককথায় অনবদ্য এবং এক যুগান্তকারী বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে।

২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচন কেবলমাত্র একটি বিধানসভা নির্বাচন মাত্র ছিল না। এই নির্বাচন বাঙালি হিন্দুদের ধর্ম, জীবন ও জীবিকা, এককথায় সমগ্র অস্তিত্ব রক্ষারই লড়াই ছিল। এরই পাশাপাশি, তৃণমূল কংগ্রেসের মতো এক ভয়াবহ দেশবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের সমূলে উৎপাটিত করাও ছিল অত্যন্ত আবশ্যক। এর কারণ, তৃণমূলের অপশাসনের জন্য সমগ্র ভারতের জাতীয় নিরাপত্তাই বিঘ্নিত হয়ে পড়েছিল। এখানে আরও একটি কথা বলা দরকার। কংগ্রেস, সিপিএম এবং তৃণমূল, অর্থাৎ এই রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দলই চিরদিনই নির্লজ্জভাবে মুসলমান তোষণ করে এসেছে। তৃণমূল আমলে মুসলমানরা হয়ে উঠেছিল 'দুধেল গাই'। তাদের জন্য এই রাজ্যে ছিল না কোনও আইন এবং সমস্ত রকম অপরাধ করবার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের তরফ থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, তৃণমূল ছিল বাংলাদেশ থেকে আগত অবৈধ মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের একেবারে ঘোষিত সমর্থক। মুসলিম ভোট-ব্যাংক রক্ষার্থে তাই এস. আই. আরকে কিভাবে আটকানো যায় বা বিঘ্নিত করা যায়, এই বিষয়ে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করেছিল তৃণমূল। কথায় বলে যে, 'খলের ছলের অভাব হয় না'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে এই কথা একেবারে সর্বাংশেই প্রযোজ্য। পাশাপাশি এটাও সত্য যে, আসুরিক তথা শয়তানী শক্তি যতই প্রচেষ্টা করুক না কেন, অন্তিমে তাদের পরাজয় এবং ঐশ্বরিক শক্তির বিজয় সুনিশ্চিত। রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি সকল ধর্মগ্রন্থে এই সত্যই নিহিত রয়েছে। এই নির্বাচনও ছিল শুভ শক্তির সঙ্গে অশুভ শক্তির লড়াই এবং এই লড়াইতে শুভ শক্তিই জয়যুক্ত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন, ২০২৬ আবারও প্রমাণ করে দিয়েছে যে, রাম-রাবণের যুদ্ধে চিরদিনই রাবণের পরাজয় এবং রামেরই জয় হয়ে থাকে। এটাই হল বিধির বিধান।

চলতি বিধানসভা ভোটে পশ্চিমবঙ্গে সর্বকালীন রেকর্ড ৯৩ শতাংশ ভোট পড়েছিল। উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের দিকে তাকিয়ে ছিল সারা দেশ। শুধু তাই নয়, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন দেশের নজর ছিল এই রাজ্যের নির্বাচনী ফলাফলের দিকে। শ্যামাপ্রসাদের বাংলায় এই প্রথমবারের জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর ভোটেই সরকার গঠন সম্ভব হল। তাই এবারের রাজ্য সরকার হল নিঃসন্দেহেই হিন্দুদের ভোটে উঠে আসা হিন্দুত্ববাদী সরকার। বিহার (অঙ্গ) এবং ওড়িশার (কলিঙ্গ) পর এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি এবং মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহজির বঙ্গ বিজয়ও সম্পূর্ণ হল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ সহ বিভিন্ন হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনগুলোর অবদানও এই ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহেই অনঃস্বীকার্য। কারণ রাজ্যের কোণায় কোণায় হিন্দুত্ব তথা রাষ্ট্রবাদের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে এই সকল প্রতিষ্ঠান বহু রকম প্রতিকূলতা সত্তেও অবিরাম কাজ করে চলেছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নানাবিধ কুকর্মের দোসর তৃণমূলের বিভিন্ন মন্ত্রী তথা হেভিওয়েট নেতা-নেত্রীরা তো বটেই, এমনকি হিন্দু বাঙালির শত্রু দেশবিরোধী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে (যা মমতার নিজের গড় বলে পরিচিত) বিপুল ভোটে পরাজিত

হয়েছে। এই ভাবেই হিন্দুর শত্রু, বাঙালির শত্রু, ভারতের শত্রু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখের উপর জবাব দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের জনগণ। নিঃসন্দেহে এবারের বিধানসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভারতের নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করতেই হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে এস.আই. আর সহ নির্বাচনের সমস্ত ক্ষেত্রেই চূড়ান্ত রকম ভাবে অসহযোগিতা করা হয়েছে। তৃণমূল গোড়া থেকেই চেষ্টা করছিল যাতে এস.আই.আর সহ নির্বাচনী প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তরে গোলমাল সৃষ্টি করা যায়। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের সুনির্দিষ্ট এবং পরিকল্পনা মাফিক নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে তৃণমূলের অসাধু চক্রান্তগুলো সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ হয়েছে। এখানে একটা কথা না বললেই নয়। তা হল এই যে, এই নির্বাচনে বিজেপির বিপরীতে ছিল হিন্দু বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দল। এরা নিজেদের ঘৃণ্য ধান্দার প্রচার ও প্রসারের কারণে তৃণমূলীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল এবং প্রচার করেছিল যে, 'no vote to BJP'—কিন্তু, নির্বাচনের ফলাফলে এটা স্পষ্ট যে, হিন্দুত্বের সাইক্লোনে শুধুমাত্র মমতাই যে কুপোকাত হয়েছে তা নয়; দেশবিরোধী তথা হিন্দুবিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলই তাদের প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গিয়েছে। আসলে তৃণমূলের অপশাসনে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মানুষের। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিকাঠামোর উন্নয়ন, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য, নারী-নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি কোনও ক্ষেত্রেই তৃণমূল সরকার পশ্চিমবঙ্গের মানুষের আশা পূরণ করতে পারেনি। কাটমানি, সিন্ডিকেট, তোলাবাজি ইত্যাদি হয়ে উঠেছিল তৃণমূলের একমাত্র পরিচয়। এরই পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে ঘটে গিয়েছিল এক ভয়াবহ বিপর্যয়। পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিন্দু সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে তার পরিবর্তে এই রাজ্যে আরবি সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তৃণমূলের তরফে। এই রাজ্যের জেলায় জেলায় বিস্তীর্ণ অঞ্চলে হিন্দুরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে অতি দ্রুত জনবিন্যাস বদলে যাচ্ছিল, যা সার্বিক নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করছিল। এই রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় (এমনকি কলকাতা শহরেও) মুসলমান কর্তৃক হিন্দুদের ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, হিন্দুদের দোকানপাট লুঠ করে নেওয়া, হিন্দু নারীদের উপরে অকথ্য নির্যাতন করা এবং তাদের সম্ভ্রম নষ্ট করা, শুধুমাত্র হিন্দু হওয়ার অপরাধে নির্মম ও নৃশংসভাবে হিন্দুদের খুন করা, হিন্দুদের দেবালয় ভাঙচুর করা, হিন্দু দেব-দেবীর বিগ্রহ ভেঙে দেওয়া, লাভ জিহাদ, ল্যান্ড জিহাদ ইত্যাদির খবর সংবাদ মাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু সময়েই প্রকাশিত হয়েছে। দুর্গাপূজা ও রামনবমীর সময় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় পূজা মন্ডপে আক্রমণ চালিয়েছে মুসলমান জিহাদিরা। শান্তিপূর্ণ ধর্মীয় শোভাযাত্রাতে আক্রমণ করতেও পাষণ্ড মুসলমানেরা কুণ্ঠিত হয়নি। আজানের সময় দুর্গাপূজার মন্ডপে ঢাক বাজানো যাবে না, এমন বিভিন্ন ফতোয়াও দেওয়া হয়েছে এই পশ্চিমবঙ্গেই। এই সবই আসলে তৃণমোল্লাদের অপশাসনের অনিবার্য পরিণতি। বস্তুতঃ পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা এই তৃণমোল্লাদের হাত থেকে মুক্তির পথ খুঁজছিল। এবারের বিধানসভা নির্বাচন হিন্দুদের এই বহুকাঙ্ক্ষিত মুক্তির সন্ধান দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে যে কথাটি না বললেই নয় তা এই যে, নির্বাচন কমিশনের অত্যন্ত সুপরিকল্পিত এবং সদর্থক ও কঠোর পদক্ষেপের কারণেই পশ্চিমবঙ্গের এবারের বিধানসভা নির্বাচন এত নিপুণভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে। শহর থেকে গ্রাম, উত্তর থেকে দক্ষিণ, এই রাজ্যের সর্বত্রই এবারের নির্বাচনে হিন্দুরা নিরাপদে এবং নির্ভয়ে ভোট দিতে সমর্থ হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের কড়া দাওয়াই-এর ফলে তৃণমূলী গুণ্ডাবাহিনী এতটুকুও গুণ্ডামি করবার সুযোগ পায়নি। এমনকি ২০২১-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের ভোট গণনার ক্ষেত্রে তৃণমূল ছলে-বলে-কৌশলে যে কারচুপি করেছিল, এবারে তাও করা তৃণমূলের পক্ষে একেবারেই সম্ভব হয়নি। এরই ফলে তৃণমূল মাত্র ৮০টি আসন নিয়ে কোনমতে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছে। একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে অতি সত্বর পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূল কংগ্রেস নামক এই সন্ত্রাসবাদী ও দুষ্কৃতকারীদের দলটির অস্তিত্ব সম্পূর্ণই বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা আজ ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হয়েছে। ২০২৬-এর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার নির্বাচনের ফলাফল এটাই প্রমাণ করেছে যে ঐক্যবদ্ধ হিন্দুত্বের কাছে, সমষ্টিগত হিন্দুচেতনার কাছে দানবিক শক্তির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ আবার ফিরে পাবে তার অতীত গৌরব। হিন্দুত্বের জয়ধ্বজা পশ্চিমবঙ্গে স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগামী দিনে সমস্ত ভারত এক মহান হিন্দুরাষ্ট্র রূপে সমগ্র বিশ্বে পরিচিত হবে ও বিশ্বকে উন্নত আদর্শের পথ প্রদর্শন করবে, এটাই কাম্য। ■

সংস্কৃতের পুনরুজ্জীবন : আধুনিক ভারতকে পুনঃসংযুক্ত, উদ্ভাবনী ও অনুপ্রাণিত করার একটি পথ

বরিষণ চট্টোপাধ্যায়

সংস্কৃত—যা প্রায়শই বহু ভারতীয় ভাষার জননী হিসেবে গণ্য হয়;কেবল একটি প্রাচীন ভাষা নয়, বরং গভীর জ্ঞান, যৌক্তিক কাঠামো এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক বিশাল ভাণ্ডার। আধুনিক ভারতে, সংস্কৃতের প্রাসঙ্গিকতা তার প্রথাগত শিকড়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে বহুদূর বিস্তৃত—এটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, শিক্ষা এবং ব্যক্তিগত বিকাশের ক্ষেত্রে অপার সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করে। এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে যে, কেন বর্তমান প্রজন্মের ভারতীয়দের সংস্কৃতকে 'ভবিষ্যতের ভাষা' হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।

১. বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রজ্ঞার দ্বার উন্মোচন

সংস্কৃত হল প্রাচীন বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং মনোবিজ্ঞানের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রের বহু মৌলিক ভারতীয় গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতেই রচিত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, আর্যভট্টের জ্যোতির্বিজ্ঞান-বিষয়ক গ্রন্থাবলি এবং চরকের চিকিৎসাবিজ্ঞান-বিষয়ক রচনাগুলো এই ভাষাতেই লিপিবদ্ধ রয়েছে। সংস্কৃত চর্চার মাধ্যমে আমরা এই গ্রন্থগুলোর পাঠোদ্ধার করতে পারি এবং এমন সব জ্ঞান পুনরায় আবিষ্কার করতে পারি, যা আধুনিক বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত প্রেক্ষাপটেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োগযোগ্য।

তাছাড়া, সংস্কৃতের সুশৃঙ্খল ব্যাকরণ এবং দ্ব্যর্থহীন প্রকৃতি এটিকে বৈজ্ঞানিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে অত্যন্ত উপযোগী করে তুলেছে। এই ভাষা অধ্যয়নের মাধ্যমে ভারতীয়রা এমন এক বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার লাভ করতে পারে, যা আমাদের সমৃদ্ধ অতীতকে অনুধাবন করতে এবং সমসাময়িক চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় সেই জ্ঞানকে কাজে লাগাতে অপরিহার্য।

২. সংস্কৃত এবং আধুনিক প্রযুক্তি

সংস্কৃতের ব্যাকরণ---যা পাণিনি কর্তৃক তাঁর 'অষ্টাধ্যায়ী' গ্রন্থে সুসংহত ও বিধিবদ্ধ করা হয়েছে—স্বভাবগতভাবেই অ্যালগরিদমিক এবং অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণেই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (NLP) এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর মতো ক্ষেত্রগুলোতে প্রয়োগের জন্য সংস্কৃত একটি আদর্শ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হয়। গুগল-এর মতো বিশ্বখ্যাত প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এবং আইআইটি (IIT)-এর মতো গবেষণা কেন্দ্রগুলো দক্ষ অ্যালগরিদম তৈরি ও মানুষ-যন্ত্রের মিথস্ক্রিয়া (human-machine interaction) সহজতর করার লক্ষ্যে সংস্কৃতের সম্ভাবনা যাচাই ও গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছে।

উদাহরণস্বরূপ :

প্রাকৃতিক ভাষা প্রক্রিয়াকরণ (NLP) : সংস্কৃতের মডুলার বা খণ্ডভিত্তিক এবং নিয়ম-নির্ভর কাঠামো উন্নত মানের NLP অ্যালগরিদম তৈরির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) : এর স্বচ্ছতা এবং যৌক্তিক বাক্যবিন্যাস কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও শক্তিশালী করার জন্য একটি সুদৃঢ় কাঠামো প্রদান করে।

বাক্য শনাক্তকরণ (Speech Recognition) : সংস্কৃতের অত্যন্ত সুনির্দিষ্ট ও নির্ভুল ধ্বনিবিজ্ঞান (phonetics) সঠিক ও নিখুঁত বাক্য শনাক্তকরণ এবং সংশ্লেষণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে কাজ করে।

সংস্কৃতের এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে ভারত অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে বিশ্বমঞ্চে নিজেকে একটি শীর্ষস্থানীয় দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

৩. সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত ঐক্যের ভিত্তি

সংস্কৃত হল হিন্দি, বাংলা, মারাঠি এবং কন্নড়-এর মতো বহু ভারতীয় ভাষার মূল উৎস বা ভিত্তি। সংস্কৃত চর্চা কেবল আমাদের ভাষাগত দক্ষতাকেই বৃদ্ধি করে না, বরং ভারতের বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও রূপবৈচিত্র্য সম্পর্কে আমাদের বোঝাপড়াকেও আরও গভীর ও সমৃদ্ধ করে তোলে। এটি একটি সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে,

যা ভারতীয়দের তাদের অভিন্ন ঐতিহ্যের সাথে সংযুক্ত করে এবং জাতীয় গর্ব ও একতার বোধ জাগিয়ে তোলে।

তাছাড়া, বেদ, উপনিষদ এবং মহাভারতের মতো সংস্কৃত গ্রন্থগুলো কেবল ধর্মীয় শাস্ত্রই নয়, বরং দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং শাসনব্যবস্থা বিষয়ক জ্ঞানেও সমৃদ্ধ। এই ভাষাটি শেখার মাধ্যমে ব্যক্তিরা গ্রন্থগুলোকে তাদের মূল রূপে ব্যাখ্যা করার সুযোগ পায়—যা অনুবাদের ফলে সৃষ্ট কোন পক্ষপাত বা ত্রুটিমুক্ত।

৪. প্রজ্ঞাবৃত্তিক ও ব্যক্তিগত বিকাশ

অসংখ্য গবেষণায় দেখা গেছে যে, সংস্কৃত শেখা মানুষের প্রজ্ঞাবৃত্তিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এর সুশৃঙ্খল ব্যাকরণ এবং ধ্বনিগত নির্ভুলতা মস্তিষ্কের সেই অংশগুলোকে উদ্দীপিত করে, যা স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ এবং বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনার সাথে যুক্ত। সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তির সাথে উন্নত স্মৃতিধারণ ক্ষমতা এবং মানসিক স্বচ্ছতার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া গেছে।

এর প্রধান প্রজ্ঞাবৃত্তিক সুবিধাগুলোর মধ্যে রয়েছে :

◆ সমস্যা সমাধানের দক্ষতার বৃদ্ধি।

◆ ভাষাগত মেধার উন্নতি।

◆ স্মৃতিশক্তি ও একাগ্রতার সুদৃঢ়করণ।

এই সুবিধাগুলোর কারণে সংস্কৃত কেবল গবেষক ও পণ্ডিতদের জন্যই নয়, বরং ব্যক্তিগত বিকাশ ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষকামী যে-কারো জন্যই একটি অত্যন্ত মূল্যবান মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয়।

৫. জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০-এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান

জাতীয় শিক্ষানীতি (NEP) ২০২০ ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় সংস্কৃতের অন্তর্ভুক্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই নীতি সংস্কৃত ভাষাকে নৈতিক শিক্ষা, সাংস্কৃতিক সচেতনতা এবং সামগ্রিক শিক্ষার প্রসারে একটি মূল চাবিকাঠি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে সংস্কৃতকে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ভারত শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা এবং নিজস্ব ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীরতর বোধ জাগিয়ে তুলতে পারে।

৬. সংস্কৃত : ভবিষ্যতের ভাষা

অতীতের কেবল একটি স্মৃতিচিহ্ন হয়ে থাকার পরিবর্তে, সংস্কৃত এখন ভবিষ্যতের ভাষা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI), কম্পিউটেশনাল ভাষাবিজ্ঞান এবং মেশিন লার্নিং-এর ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ আধুনিক বিশ্বে এই ভাষার অভিযোজন ক্ষমতা ও প্রাসঙ্গিকতাকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। সংস্কৃত গ্রন্থগুলোর ডিজিটাইজেশন এবং সংস্কৃত-ভিত্তিক কোডিং প্ল্যাটফর্মগুলোর উদ্ভাবন নতুন নতুন গবেষণার ক্ষেত্র ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

উপসংহার

সংস্কৃতের সাথে পুনরায় সংযুক্ত হওয়া মানে কেবল একটি প্রাচীন ভাষাকে সংরক্ষণ করা নয়—বরং এটি এমন একটি মাধ্যমকে আপন করে নেওয়া, যা উদ্ভাবন, বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ এবং সাংস্কৃতিক গর্ববোধকে লালন করে। আধুনিক ভারতীয়দের কাছে সংস্কৃত শেখা হল নিজেদের শিকড় বা মূল ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কারের পথে একটি পদক্ষেপ—এটি বৈশ্বিক প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে অবদান রাখার এবং নিজেদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনকে সমৃদ্ধ করার একটি উপায়।

পদক্ষেপ গ্রহণের উপযুক্ত সময় এখনই। প্রাচীন সংস্কৃত পণ্ডিতরা যেমনটি প্রজ্ঞার সাথে বলে গেছেন—''अद्य एव इदानीम् एव'' (আজই, ঠিক এই মুহূর্তেই)। আসুন, আমরা আমাদের ঐতিহ্য নিয়ে গর্ববোধ করি এবং সংস্কৃতকে ভারতের এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথে অগ্রযাত্রার একটি মূল ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করি। ■

মাদপুর প্রখণ্ডে দুর্গাবাহিনীর রামমহোৎসব পালন

মোহিনী একাদশী

অর্পিতা বোস

একাদশী হল হিন্দু পঞ্জিকা অনুসারে প্রতি চান্দ্রমাসের শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষের একাদশতম তিথি, যা বিষ্ণু বা কৃষ্ণের উপাসনার জন্য অত্যন্ত পবিত্র বলে মনে করা হয়। মূলত একাদশী একটি ব্রত যা বহু বছর আগে শুরু হয়েছিল। একবার ভগবান বিষ্ণু হিমালয়ের 'সিংহবতী' নামক গুহায় মুর্দানবের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধ শেষে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তখন তিনি শয়ন বা ধ্যানরত অবস্থায় ছিলেন। ঠিক সেইসময় মুর্দানব ভগবান বিষ্ণুকে পুনরায় যুদ্ধের জন্য আহ্বান জানায় এবং আক্রমণ করার চেষ্টা করে। মুর্দানবের একটি বর ছিল যে, কোন মানুষ তাকে পরাজিত করতে পারবে না। তাই ভগবান বিষ্ণু তাঁর শরীরের এগারোটি আধ্যাত্মিক অংশের শক্তি মিলিয়ে তা থেকে এক অপ্সরীকে সৃষ্টি করলেন। মোহগ্রস্ত মুর্দানব সেই অপ্সরীকে দেখে, তাকে বিয়ে করতে চান। যার উত্তরে সেই নারী বলেন, যদি তাকে (অপ্সরীকে) যুদ্ধে, মুর্দানব পরাজিত করতে পারে তাহলেই তাদের বিয়ে হবে। তারা যুদ্ধ করে এবং সেই যুদ্ধে মুর্দানব নিহত হয়। বিষ্ণু ঘুম থেকে জেগে উঠে ওই নারীকে একাদশী নাম দিয়ে আশীর্বাদ করে, তাঁকে সমস্ত তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হওয়ার বর দেন এবং বলেন কেউ যদি এই দিনে উপবাস করে, তবে তার মোক্ষ লাভ হবে।

একাদশীর দিনে ভক্তরা ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণে রেখে উপবাস পালন করেন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রার্থনা করেন। কারণ এই উপবাস পালন করলে আত্মা পবিত্র হয় এবং ভগবান বিষ্ণুর আশীর্বাদে ধন, সৌভাগ্য, সুখ, সমৃদ্ধি ইত্যাদি লাভ হয়। এই উপবাস পালন করলে পরিবারে সুখ-শান্তি বিরাজ করে এবং ঘরে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হয়। হিন্দু ধর্মে একাদশী ব্রত মূলত বছরে ২৪টি (অধিমাস অর্থাৎ মলমাস থাকলে ২৬টি) হয়, যা ১২টি মাসের কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষে বিভক্ত। প্রত্যেক একাদশীর নিজস্ব নাম, মাহাত্ম্য ও অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আছেন। প্রধান একাদশীগুলোর মধ্যে নির্জলা, কামদা, মোহিনী, অন্নদা ও বৈকুণ্ঠ একাদশী উল্লেখযোগ্য, যা পাপক্ষয় ও মোক্ষ লাভের উদ্দেশ্যে উপবাসের মাধ্যমে পালিত হয়। আমাদের আজকের আলোচ্য বিষয় হল মোহিনী একাদশী।

বৈশাখ মাসকে ভীষণ পবিত্র মনে করা হয়, কারণ এই মাসটি ভগবান বিষ্ণুর নামে সমর্পিত। বৈশাখ মাসের শুক্ল পক্ষের একাদশী তিথি মোহিনী একাদশী নামে পরিচিত। পুরাণ অনুসারে, মোহিনী একাদশীতে মোহিনী রূপ অর্থাৎ নারী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন ভগবান শ্রীবিষ্ণু। বিষ্ণুর অসংখ্য রূপের মধ্যে এই মোহিনী রূপই একমাত্র নারী রূপ। এই তিথিতে শ্রীবিষ্ণুর নারী-রূপের আরাধনা করা হয়। এই মোহিনী একাদশীর ব্রত পালনের কারণ হিসাবে পুরাণে বেশ কিছু কাহিনি প্রচলিত আছে।

মোহিনী শব্দের অর্থ 'জাদুকরী', যা 'মোহ' শব্দ থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'প্রলুব্ধ করা' এবং 'মোহভঙ্গ করা'। পুরাণ অনুসারে, সমুদ্র মন্থনের পর অমৃতের ভাণ্ড উঠে আসতেই, অসুররা তা কেড়ে নিয়েছিল। এতে দেবতারা ভয় পেয়ে যান। এমতাবস্থায় দেবতারা নারায়ণের শরণাপন্ন হন, তখন বিষ্ণু এক অপরূপ সুন্দরী নারীর রূপ ধারণ করেন। বিষ্ণুর সেই মনোমোহিনী রূপে অসুররা মোহিত হয়ে পড়ে। সেই সুযোগে, ভগবান বিষ্ণু রূপের দ্বারা অসুরদের ভুলিয়ে তাদের থেকে অমৃত ফেরত নেন। মোহিনী অবতার সত্ত্বেও বিষ্ণুকে চিনতে পেরে যান দুই অসুর, রাহু ও কেতু। অমৃত পান করার অভিলাসে, তারা দেবতার ছদ্মবেশে দেবতাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাদের চিনে ফেলে সূর্য ও চন্দ্র, তাঁরা বিষ্ণুকে তা জানান। বিষ্ণু সেই মুহূর্তেই সুদর্শন চক্র দিয়ে রাহু ও কেতুর মাথা শরীর থেকে কেটে আলাদা করে দেন।

বিষ্ণুর মোহিনী অবতার নিয়ে আরও একটি কাহিনি প্রচলিত আছে। মোহিনী রূপ নিয়েই নাকি ভষ্মাসুরের থেকে মহাদেবকে রক্ষা করেছিলেন বিষ্ণু। ভষ্মাসুর নামে এক অসুর মহাদেবের কাছ থেকে এই বর পায় যে, সে যার মাথায় হাত দেবে, সেই ভষ্ম হয়ে যাবে। মহাদেবের কাছ থেকে এই বর পেয়ে মহাদেবের মাথাতেই হাত রাখতে উদ্যত হয় ভষ্মাসুর। তখন মহাদেবকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেন বিষ্ণু। মোহিনী অবতার রূপ ধারণ করে ভষ্মাসুরকে মুগ্ধ করেন তিনি। মোহিনীর রূপের জাদুতে সব ভুলে গিয়ে মোহিনীর সঙ্গে নৃত্য করতে থাকেন তিনি। নাচতে নাচতে একবার ভষ্মাসুরের হাত তার নিজের মাথাতেই রাখেন বিষ্ণু। নিজের মাথায় হাত রাখার ফলে নিজেই

পুড়ে ভস্ম হয়ে যায় ভস্মাসুর।

অন্যদিকে, কুর্ম্মপুরাণে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের 'মোহিনী' একাদশীর ব্রত মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। মহারাজ যুধিষ্ঠির একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন যে, ''হে জনার্দন !বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষীয় একাদশীর কী নাম, কী ফল ও কী বিধি তা আপনি কৃপা করে আমাকে বলুন।'' তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম পুত্রকে বললেন, ''হে ধর্মপুত্র, আপনি যে প্রশ্ন আমায় করলেন, ক্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, মহামুনি বশিষ্ঠের কাছে এই একই প্রশ্ন রেখেছিলেন। রামচন্দ্র বলেছিলেন, একটি উত্তম ব্রতের কথা আমাকে বলুন। যার দ্বারা সকল পাপ ক্ষয় হয় ও সকল দুঃখ বিনষ্ট হয়।'' এই প্রশ্নের উত্তরে মহামুনি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে মোহিনী একাদশী পালনেরর কথা বলে বলেন। ত্রেতা যুগে মহর্ষি বশিষ্ঠের কথায় এই ব্রত পালন করেছিলেন রামচন্দ্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, ''ত্রিলোকে মোহিনী ব্রতই শ্রেষ্ঠ ব্রত। যজ্ঞ, তীর্থভ্রমণ, দান ইত্যাদি কোন পুণ্যকর্মই এই ব্রতের সমান নয়। এই ব্রত কথার শ্রবণ কীর্তনে সহস্র গোদানের ফল লাভ হয়।'' এই ব্রতের প্রভাবে সমস্ত ধরনের দুঃখ নিবারণ করা যায়, পাশাপাশি সমস্ত পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মনে করা হয়, মোহিনী একাদশীতে বিষ্ণুর পাশাপাশি লক্ষ্মীর পুজো করলে অর্থ লাভ হয়, ঘর-পরিবার ধন-ধান্যে ভরে ওঠে। এই উপবাস পালন করলে পরিবারে সুখ-শান্তি বিরাজ করে এবং ঘরে ইতিবাচক শক্তি প্রবাহিত হয়। বিশ্বাস করা হয়, মোহিনী একাদশীর উপবাস পালন করলে, মৃত্যুর পরে মোক্ষ লাভ হয়।

মোহিনী একাদশীর দিনে, ভক্তরা ব্রহ্ম মুহূর্তে ঘুম থেকে উঠে, স্নান করে, পরিষ্কার পোশাক পরে, ধ্যান করেন এবং উপবাসের প্রতিজ্ঞা করেন। এরপর একটি হলুদ কাপড় বিছিয়ে ভগবান বিষ্ণুর একটি মূর্তি বা ছবি রেখে এবং চারপাশে গঙ্গা জল ছিটিয়ে দিয়ে, পঞ্চামৃত দিয়ে অভিষেক করেন। ভগবান বিষ্ণুকে নৈবেদ্য যেমন— চাল, চন্দন, ফল, তুলসী পাতা, ফুল, প্রদীপ ইত্যাদি নিবেদন করা হয়। ভগবান বিষ্ণুর মন্ত্র জপ এবং একাদশীর উপবাসের গল্প পাঠ ও শ্রবণ করেন ভক্তরা। তারপর ভজন কীর্তন শেষে এবং ঘি-এর প্রদীপ দিয়ে আরতি করা হয়। অনেক ভক্তরা আবার রাত্রি জাগরণ করে উপবাস সমাপ্ত করেন। ২০২৬ খ্রিস্টাব্দে, এটি ২৭শে এপ্রিল, সোমবার পালিত হবে। ■

রবীন্দ্র সাহিত্যে ভগবান বুদ্ধ

রবিব্রত ঘোষ

আমি বললুম, 'মাস্টারমশায়, অমন করে কথায় বলতে গেলে টাক-পড়া উপদেশের মতো শোনায়; কিন্তু যখনই চোখে ওকে আভাসমাত্রেও দেখি তখন যে দেখি ঐটেই অমৃত। দেবতারা এইটেই পান করে অমর। সুন্দরকে আমরা দেখতেই পাইনে যতক্ষণ না তাকে আমরা ছেড়ে দিই। বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজান্ডার করেননি, এ কথা যে তখন মিথ্যেকথা যখন এটা শুকনো গলায় বলি। এই কথা কবে গান গেয়ে বলতে পারব? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের এই-সব প্রাণের কথা ছাপার বইকে ছাপিয়ে পড়বে কবে, একেবারে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গার নির্ঝরের মতো?'

উপরের অংশটা রবীন্দ্রনাথের একটি বিখ্যাত উপন্যাসের। সচরাচর লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি লেখার মধ্যে দিয়েই ফুটে ওঠে। এই লেখায় রবীন্দ্রনাথ একটি প্রশ্ন তুলেছেন। কেন আলেকজান্ডারকে গ্রেট বলা হবে? পৃথিবীর ইতিহাস মানুষের ইতিহাস। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতাকে কাটিয়ে ওঠার ইতিহাস। সেই ইতিহাসে সাধারণ মানুষ থেকে রাজা-মহারাজা কবি সাহিত্যিক সবারই অংশগ্রহণ আছে। কিন্তু এক আশ্চর্য রকমের ঘটনা যে, গ্রেট তাদের কেই বলা হয় যারা হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করতে পেরেছেন, তাদেরকে পরাধীন করতে পেরেছেন, তাদেরকে দাস বানাতে পেরেছেন, তাদের জায়গা বসতবাড়ি সমস্ত কিছুকে দখল করে এক নিমেষে তাদেরকে উদ্বাস্তু বানাতে পেরেছে। রবীন্দ্রনাথ বিকল্প প্রশ্ন তুলেছেন। যারা মানুষকে কাছে টানতে পেরেছে, মানুষের দুঃখ দুর্দশায় পাশে দাঁড়াতে পেরেছে, যারা মানুষের কাছে ভালোবাসার মন্ত্র নিয়ে গেছে জাতি ধর্ম-বর্ণের বিভিন্ন রকমের বাঁধন ভেঙ্গে দিয়ে কাছে আনতে পেরেছে, তারা কেন গ্রেট হবে না। যারা হিংসার তরবারি নিয়ে ঘুরবে তারা কেন গ্রেট হবে? যারা প্রেম

এবং ভালোবাসার মন্ত্র নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছেছে। তারা কেন গ্রেট নন? এখন এই প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয় কিন্তু আজ থেকে প্রায় একশ বছরও বেশি আগে এই প্রশ্ন আলোচনা হবার কোন প্রশ্নই ছিল না। কারণ এই প্রশ্নটি মানুষের মনে কখনো তুলে ধরাই হয়নি। বিদেশিদের তৈরি করা ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমরা আমাদের নিজেদের অতীত ইতিহাসের দিকে কখনো তাকাইনি।

লেখাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ভগবান বুদ্ধের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার প্রকাশ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ বৌদ্ধ ছিলেন না, উনি ছিলেন ব্রাহ্ম। কান্তদর্শী মানুষ, ঋষি তুল্য মনন ছিল বলেই বুদ্ধের মহানুভবতা আর অসাধারণ জীবন রবীন্দ্রনাথকে প্রভাবিত করেছিল।

সুবিশাল রবীন্দ্র সাহিত্যে বুদ্ধদেবের উল্লেখ বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থের অনেক আখ্যানই গ্রহণ করেছেন বৌদ্ধ কাহিনী থেকে। এই গ্রন্থ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে মেলে—'এই গ্রন্থে যে-সকল বৌদ্ধ-কথা বর্ণিত হইয়াছে তাহা রাজেন্দ্রনাথ মিত্র-সংকলিত নেপালী বৌদ্ধসাহিত্য সম্বন্ধীয় ইংরাজি গ্রন্থ হইতে গৃহিত।'

'কথা ও কাহিনী' গ্রন্থের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে কবি অন্যত্র বলেছেন, ''এক সময়ে আমি যখন বৌদ্ধ কাহিনি এবং ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি জানলুম তখন তারা স্পষ্ট ছবি গ্রহণ করে আমার মধ্যে সৃষ্টির প্রেরণা নিয়ে এসেছিল। অকস্মাৎ 'কথা ও কাহিনী'র গল্পধারা উৎসের মতো নানা শাখায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল। সেই সময়কার শিক্ষায় এই-সকল ইতিবৃত্ত জানবার অবকাশ ছিল, সুতরাং বলতে পারা যায় 'কথা ও কাহিনী' সেই কালেরই বিশেষ রচনা।''

'কথা' ও 'কাহিনী'র এই ৩৩টি কবিতাই বৌদ্ধ-কাহিনীজাত। এই সংকলনের প্রায় পুরোটাই বুদ্ধ প্রসঙ্গ। 'শ্রেষ্ঠভিক্ষা, 'মস্তক বিক্রয়, 'পূজারিণী', 'অভিসার', 'পরিশোধ', 'সামান্য ক্ষতি', 'মূল্যপ্রাপ্তি', 'নগরলক্ষ্মী', 'শাপমোচন' প্রভৃতি কবিতায় বৌদ্ধ আখ্যানের প্রত্যক্ষ গ্রহণ রয়েছে।

এর বাইরেও অজস্র কবিতা রয়েছে যাতে বৌদ্ধ-সংস্কৃতির উপকরণ রয়েছে। তবে 'পুনশ্চ' কাব্যের 'শাপমোচন', 'পরিশেষ' কাব্যের 'বুদ্ধজন্মোৎসব', 'বোরোবুদুর', 'সিয়াম', 'বুদ্ধদেবের প্রতি', 'প্রার্থনা', 'বৈশাখী পূর্ণিমা'; 'পত্রপুট' কাব্যের ১৭-সংখ্যক কবিতা, 'নবজাতক' কাব্যের 'বুদ্ধভক্তি' এবং 'জন্মদিনে' কাব্যের ৩ ও ৬ সংখ্যক কবিতায় তীব্রভাবে রয়েছে ভগবান বুদ্ধের উপস্থিতি।

এ ছাড়াও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাটক। রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখেছেন ৫০টির বেশি। যেখানে বুদ্ধদেবের আদর্শ বৌদ্ধ দর্শনের কথা আর বিভিন্ন বৌদ্ধ উপাখ্যান রয়েছে। উপমহাদেশের পৌরাণিক আখ্যান থেকে তিনি সারবস্তু গ্রহণ করে, কখনো কাহিনি কখনো চরিত্রকে অবলম্বন করে তিনি নাটক রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতাকে রূপান্তর করেছেন নাটকে। আবার একই নাটক বার বার পরিমার্জন করেছেন। খেয়াল করার বিষয় হল, বৌদ্ধ আখ্যান সংবলিত নাটকগুলোর ক্ষেত্রেই এই উদ্যোগ বেশি। এ থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, বৌদ্ধ আখ্যানের প্রতি তিনি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। যেমন 'রাজা' নাটকটি তিনি চার বার পুনর্লিখন করেছেন। 'পরিশোধ' নাটকটিকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছেন 'শ্যামা' নৃত্যনাট্যে।

নাটকে আমরা দেখতে পাই ১০টি নাটকে বৌদ্ধ আখ্যান রয়েছে। মালিনী (১৮৯৬), রাজা (১৯১০), অচলায়তন (১৯১২), গুরু (১৯১৮), অরূপরতন (১৯২০), নটীর পূজা (১৯২৬), চন্ডালিকা (১৯৩৮), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮), শ্যামমোচন (১৯৩১) নাটকে বৌদ্ধ আখ্যান রয়েছে।

বৌদ্ধ আখ্যান নিয়ে রচিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম নাটকের নাম 'মালিনী'। নাটকের সূচনায় এ রচনার প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জানা যায়। এর কাহিনি অনেকটা স্বপ্নে-পাওয়া। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,স্বপ্নে-পাওয়া এই থিমের সঙ্গে যুক্ত হল মহাবস্তু-অবদানের আখ্যান। বারাণসীর রাজা কৃকির কন্যা মালিনী শ্রদ্ধা করে ভিক্ষু কাশ্যপকে। মালিনী একদিন ভিক্ষু কাশ্যপ ও তার অনুসারীদের নিমন্ত্রণ করে। এতে ক্ষুব্ধ হয় মালিনীর ব্রাহ্মণসমাজ। ভিক্ষু কাশ্যপকে নিমন্ত্রণ ও সমাদর করার অপরাধে তারা মালিনীকে নির্বাসনদণ্ড দেয়। মালিনী নির্বাসনে যাওয়ার আগে এক সপ্তাহ সময় প্রার্থনা করে। সেই প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। মালিনীকে ভালোবাসত তার ভাই, অমাত্যবর্গ ও সাধারণ মানুষ। তাঁরা ব্রাহ্মণদের আচরণের প্রতিবাদ করে এবং মালিনীর সমর্থনে একে একে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে। রাজা এই অবস্থা মেনে নিতে পারে না। তাই মেয়ে মালিনীকে বলে :

হায় রে অবোধ মেয়ে, নব ধর্ম যদি
ঘরেতে আনিতে চাস, সে কি বর্ষানদী

একেবারে তট ভেঙে হইবে প্রকাশ
দেশবিদেশের দৃষ্টিপথে? লজ্জাত্রাস
নাহি তার? আপনার ধর্ম আপনারি,
থাকে যেন সংগোপনে, সর্বনরনারী
দেখে যেন নাহি করে দ্বেষ, পরিহাস
না করে কঠোর। ধর্মেরে রাখিতে চাস
রাখ মনে মনে।

কিন্তু তাতে কোন ফল হয় না। মালিনী ও তার অনুসারীরা ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। ব্রাহ্মণরা তখন রাজার কাছে বিচার ও আশ্রয় চায়। আর তারা গোপনে ভিক্ষু কাশ্যপকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। সেই ষড়যন্ত্র অবশেষে বিফল হয়। ভিক্ষু কাশ্যপ বেঁচে থাকে আর অন্যায়কারী ব্রাহ্মণরা পরাজিত হয়। সংক্ষেপে এই হচ্ছে মালিনী নাটকের কাহিনি। বৌদ্ধ আখ্যান অক্ষুণ্ণ রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই নাটকে সুপ্রিয় ও ক্ষেমংকর নামে দুটি পৃথক চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা চন্ডালিকা নৃত্যনাট্যে চন্ডাল কন্যা চন্ডালিকার অশ্রু প্রবাহ বিরাজমান।

প্রসঙ্গতঃ মানব জাতির তৃষ্ণা মেটানোর জন্যে জল নিতান্ত প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর লেখা 'চণ্ডালিকা' শীর্ষক নৃত্যনাট্যে বলেছেন, ''আমি যে মানব, তুমি ও সেই মানব। যেই দেবতা বা ব্রাহ্মণ জাতিভেদ প্রথার মাধ্যমে মেহনতি মানব সমাজকে অন্ধকারে রাখেন আমি তাঁর পূজা করি না।'' মানবতা এবং ধর্মকে অপব্যবহার করে মানুষ মানুষকে চণ্ডাল বানায় কেন? মানুষ মানুষের আত্মীয় স্বজন। মানুষ মানুষের রক্ষার জন্যে। মানুষ হয়ে মানুষকে হিংসা করা অপরাধ। বাঙালি আজ দেশে-বিদেশে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা' পড়ে মানবতার সাধনা আলোচনায় বুদ্ধের অহিংসা পরম ধর্ম সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু গানেও ভগবান বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দর্শনের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এর মধ্যে একটি বিখ্যাত গান হল 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানটি (বুদ্ধ জন্মোৎসব উপলক্ষে রচিত ২১শে ফাল্গুন, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ)—

'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব
ঘোর কুটিল পন্থ তার লোভ জটিল বন্ধ।
নতুন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী
কর ত্রাণ মহাপ্রাণ আন অমৃত বাণী
বিকশিত করো প্রেম পদ্ম চিরমধু নিষ্যন্দ
শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণাঘন ধরণীতল করহ কলঙ্ক শূন্য
এস দানবীর দাও ত্যাগ কঠিন দীক্ষা
মহাভিক্ষু লও সবার অহংকার ভিক্ষা।
দেশ দেশ পরিল তিলক রক্ত কলুষ গ্লানি;
তব মঙ্গল শঙ্খ আন, তব দক্ষিণ পাণি
তব শুভ সঙ্গীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে মুক্ত হে, হে অনন্ত পুণ্য
করুণা ঘন ধরনীতল করহ' কলঙ্ক শূন্য।'

১৩৩৮ বঙ্গাব্দে 'বৈশাখী পূর্ণিমা' শীর্ষক কবিতায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বৌদ্ধকবি হয়ে লিখেছিলেন—

'সকল কলুষ তামস হর' জয় হোক তব জয়!
'অমৃত বারি সিঞ্চন কর' নিখিল ভুবন ময়।
জয় হোক তব জয়!
মহাশান্তি মহাক্ষেম,
মহা পুণ্য, মহা প্রেম!'
জ্ঞানসূর্য উদয় ভাতি
ধ্বংস করুক তিমির রাতি,
'দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি' অপগত কর ভয়।
জয় হোক তব জয়।
মোহ মলিন অতি দুর্দ্দিন, শঙ্কিত চিত্ত পান্থ,
জটিল গহন পথ সঙ্কট সংশয় উদভ্রান্ত।
করুণাময়, মাগি শরণ,
দুর্গতিভয় করহ হরণ;
দাও দুঃখ বন্ধ তরণ মুক্তির পরিচয়।
জয় হোক তব জয়।
মহাশান্তি মহাক্ষেম। ■

রাম উৎসব ও হনুমান জয়ন্তী কার্যক্রম, ত্রিপুরা

ভারতের জন্য বিপদসঙ্কেত

সুদীপনারায়ণ ঘোষ

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে জার্মানিতে 'ফ্রাঙ্কফুর্ট স্কুল'-এর হাত ধরে সমালোচনামূলক তত্ত্বের (Critical Theory) উদ্ভব ঘটে; ম্যাক্স হর্কহাইমার, থিওডর অ্যাডর্নো ও হার্বার্ট মার্কুসের মতো ব্যক্তিত্বরা ছিলেন এর অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। এই তত্ত্বটি মার্কসীয় ভাবধারার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে এবং সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনীতির বিভিন্ন কাঠামো কিভাবে আধিপত্য ও নিপীড়নকে টিকিয়ে রাখে তা বিশ্লেষণের লক্ষ্যে এতে মনোবিজ্ঞান, দর্শন ও সংস্কৃতির অন্তর্দৃষ্টিসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এদের মতে প্রথাগত সমাজতাত্ত্বিক তত্ত্বগুলো মূলত সমাজের বর্ণনা প্রদানে সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু সমালোচনামূলক তত্ত্ব স্পষ্টভাবে 'প্র্যাক্সিস' (তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমন্বয়) এবং সম্মিলিত কর্মপ্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজকে সমালোচনা করে রূপান্তরের প্রয়াস চালায়।

কিন্তু আসলে কী ঘটেছে? এই তথাকথিত ক্রিটিকাল তত্ত্বের উদ্গাতারা যখন দেখল যে মার্ক্সের পুরনো তত্ত্ব আর খাটছে না, তখন আরও অনেকের সঙ্গে মিলে নতুন একটা চাল চালল। কোথাও স্বাতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলন হয়নি। রুশ বিপ্লব, চিনা বিপ্লব এমনকি ফরাসী বিপ্লব সব ধাপ্পা। মূল লক্ষ্য ছিল ক্ষমতা দখল। স্বাভাবিক সাংবিধানিক শান্তিপূর্ণ পথে সামাজিক সমস্যার সমাধানের পথ ছিল। কিন্তু তা পরিহার করে অভিসন্ধিমূলকভাবে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে কতিপয় শক্তিশালী গোষ্ঠী ক্ষমতা দখল করতে চাইল। আগেকার দিনে ব্যক্তি বিশেষ স্বীয় শৌর্য ও বীরত্ব (তার সঙ্গে অবশ্যই থাকত হিংস্রতা) দিয়ে একচ্ছত্র ক্ষমতা দখল করত। কিন্তু তার বিরুদ্ধে অনেক শত্রু থাকত যারা সেই একাধিনায়ককে ক্ষমতাচ্যুত করতে সর্বদা সচেষ্ট থাকত। ভীষণ কঠিন ছিল সেই চাপ সহ্য করা এবং দীর্ঘকাল সেই ক্ষমতা ধরে রাখা সম্ভব হত না।

তখন এক আশ্চর্য কৌশল সৃষ্টি হল। সেটা হল ব্যক্তির বদলে একটা গোষ্ঠী সেই ক্ষমতা দখল ও ধারণ করে রাখবে। কার্যক্ষেত্রে অবশ্য সেই গোষ্ঠীর একজন দলপতি সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করবে (যেমন লেনিন, স্টালিন, মাও, শি জিন পিং, কিম জঙ-উন ইত্যাদি)। সেটা করতে গেলে একটা গোষ্ঠী তৈরি রাখতে হবে। প্রথমে ক্ষমতা দখল ও পরে সেই ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য। এই অবধারণার উৎপত্তি প্লেটোর দর্শন থেকে। পরে জার্মান কৃষক আন্দোলন, ফরাসী বিপ্লব ইত্যাদি নানা উত্থানের পিছনে ছিল এই বানানো কৃত্রিম বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর এক কৃত্রিম বিক্ষোভ। খুব গালভরা মহৎ উদ্দেশ্য ছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা ইত্যাদি। এই গোষ্ঠীর সাহায্যে ক্ষমতারোহণ করেছে এক ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠী এদের সাজানো প্রতিনিধিরূপে। আপাত ও দেখানো উদ্দেশ্য ছিল সমাজে ও রাষ্ট্রের মঙ্গলসাধন।

মার্ক্সের তত্ত্ব এই ধারাকে একটা পর্যায়ে তাত্ত্বিক কাঠামো দিয়েছিল। অর্থাৎ মার্ক্সের তত্ত্ব হঠাৎ করে মাটি থেকে ফুঁড়ে ওঠেনি। কালানুক্রমে আমরা একটু এগিয়ে আসব। মার্ক্সের মৃত্যু হয় ১৮৮৩ সালে। ১৯২৩ সালে ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে গড়ে ওঠে ইন্সটিটিউট ফর সোশাল রিসার্চ। সেখান থেকে তারা খুঁজতে লাগল কিভাবে বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠি তৈরি করা যায়। এদের রমরমা আরম্ভ হয় ১৯৭০-এর দশকে।

ক্রিটিকাল তত্ত্বের উদ্গাতারা সব সময় খুঁজে বেড়ায় নানা গোষ্ঠিকে যাদের নির্যাতিতরূপে শ্রেণিভুক্ত করা যায় যাতে তাদের ঘিরে আরো আরো সংঘর্ষ দানা বেঁধে উঠতে পারে এবং দেশে অস্থিরতা ও অরাজকতা সৃষ্টি করা যায়। ভারত এমন একটা দেশ যেখানে ভাষা, ধর্ম, উপদল, জাতি, অঞ্চলের মধ্যে প্রচুর বৈচিত্র্য আছে। আর তাই এখানে নির্যাতিতত্বের বীজ বপন করে সংঘর্ষ বাঁধানোর সর্বোচ্চ সম্ভাবনা আছে। মার্ক্স এই নির্যাতনের ছুতো খুঁজে পেয়েছিলেন শিল্প বিপ্লবের ফলে উত্থিত পুঁজিপতি ও তাদের শ্রমিকদের মধ্যে যেখানে পরবর্তী অংশকে নির্যাতিত ও পুঁজিপতিদের নির্যাতনকারীরূপে দেখানো হয়েছিল। কিন্তু যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় এবং এশিয়ারও বিভিন্ন দেশে শ্রমিকদের সচ্ছলতা এল, তখন আর সেই শ্রমিক-পুঁজিপতি দ্বন্দ্ব কাজে লাগল না। তখন দরকার পড়ল আরো নতুন নতুন বাইনারি বা দ্বৈততার। আর তার ফল হল ওকিজম, যার বাংলা করা যায় জাগরণবাদ সেটাই হল নব্য মার্ক্সবাদ। এটারই বাড়বাড়ন্ত দেখা গেল ছয়ের দশকের শেষ থেকে ১৯৭০-এর গোড়ায়। ইসলামকে ছাড় দেওয়া হল

আমেরিকার সংসদে। শুধুমাত্র ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বললেই সেটা অপরাধ গণ্য হবে। অন্য সব ধর্মের বিরুদ্ধে যা খুশি বলা যাবে। কারণটা কী?

কারণ একটাই, অস্থিরতা ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে হবে। আর এই কাজটা করার জন্য ইসলামের মতো এইরকম প্রস্তুত গোষ্ঠি আর নেই। কিন্তু ইসলামিক ৫৭টা দেশে তো এইসব মতবাদ চলে না, তাহলে ইসলামকে কেন ছাড়? কিছু পেতে গেলে কিছু ছাড় দিতে হয়। ওকবাদীরা জানে যে ৫৭টা দেশ বাদ দিলেও তো দেড়শটা দেশ আছে। এদের দিয়ে ঐ সব দেশে ইসলামপন্থীদের নির্যাতিত দেখিয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা যাবে।

ভারতকে ধ্বংসের উদ্যম চলছে সংগঠিত ও পরিকল্পিত উপায়ে। গত ৪০০ বছর ধরে ভারত এই আক্রমণ ভোগ করে আসছে। যখন ১৭ শতকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে ব্যবসা করতে এল তারা এখানকার সভ্যতার সৌন্দর্য, মহনীয়তা ও প্রাচীনত্ব দেখে হতবাক হল। তারা বিস্মিত হয়ে দেখল যে সংস্কৃতের সঙ্গে ল্যাটিন, গ্রীক ও অন্যান্য ইউরোপীয় ভাষার অত্যাশ্চর্য মিল রয়েছে। তারা বুঝল যে সংস্কৃত পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষা এবং ঋগ্বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য। ভাষা ও সংস্কৃতি ভারত থেকেই পাশ্চাত্যে বিস্তার লাভ করেছে। ঐ রকম সময়েই কালিদাসের শকুন্তলা ইংরেজি ও জার্মান ভাষায় অনুদিত হয়ে ইউরোপীয়দের কল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির জন্য ইউরোপ জুড়ে ভালবাসা ও শ্রদ্ধার তরঙ্গ প্রবাহিত হল। একজন ফরাসী পণ্ডিত লুই জ্যাকোলিয়ট লিখলেন, 'প্রাচীন ভারতভূমি! অভিনন্দন, মানবতার ক্রোড়! শত শতাব্দীর পাশবিক আক্রমণের পরেও এই শ্রদ্ধেয় মাতৃভূমি বিস্মৃতির ধূলায় নিমজ্জিত হয়নি, তাঁকে অভিনন্দন! বিশ্বাস, ভালবাসা ও বিজ্ঞানের পিতৃভূমিকে অভিনন্দন তোমার অতীতকে পুনরুদ্ধার করে আমরা পাশ্চাত্যের ভবিষ্যৎ গড়তে চাই!'

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে ইউরোপীয় রেনেসাঁর শিকড় লুকিয়ে আছে প্রাচীন ভারতের মধ্যে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিকরা ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিল যে, তারা ব্রিটিশ মিশনারিদের ভারতে ইভাঞ্জেলিকাল কাজকর্ম করতে নিষেধ করেছিল। টমাস মুনরো বলেছিলেন যে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় হলে তাদের জন্য উপকারই হবে। যতদিন ভারতে তাদের আগ্রহ বাণিজ্যের মধ্যে সীমিত ছিল ততদিন সমস্যা হয়নি। কিন্তু যখনই তারা রাজনৈতিক ক্ষমতার স্বাদ পেতে চাইল তখনই গোলমাল বাঁধল। তারা দেখল ভারতীয় সংস্কৃতির জয়গান গেয়ে লাভ নেই। তারা তাদের আখ্যানকে সম্পূর্ণ উল্টে দিল। এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু সমাজকে নৈতিকভাবে অধঃপতিত বলে প্রতিপন্ন করতে লাগল। তারা বলতে লাগল যে তাদের মুক্তির একমাত্র পথ হল ব্রিটিশ শাসন ও খ্রিস্টিয়ানিটির আলো। এই উলটপুরাণকে বিশ্বাসযোগ্য দেখাতে এর চারিদিকে একটা নতুন গবেষণার আলো ছড়িয়ে দেওয়া দরকার ছিল।

জেমস মিল ভারতে কোনদিন না এসেই একটা বিশাল আকারের গ্রন্থ রচনা করলেন, 'হিস্টোরি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'। এই গ্রন্থ রচনায় তিনি সম্পূর্ণ নির্ভর করলেন খ্রিস্টিয়ান মিশনারিদের মুখের কথার উপর। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটেন তথা ইউরোপের মন থেকে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি প্রশংসার লেশমাত্র যেন মুছে যায়। তাকে যতটা সম্ভব অন্ধকারময় করে আঁকতে গোটা সভ্যতাকে তিনি পৌরাণিক বলে উড়িয়ে দিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে বোডেন চেয়ার তৈরি হল। কর্ণেল বোডেন এর অর্থ জুগিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ব্রিটেনের যুবকরা সংস্কৃত পুস্তকগুলোকে অনুবাদ করুক, যাতে হিন্দুদের খ্রিস্টান বানানো যায়। সেই লক্ষ্যে ম্যাক্স ম্যুলারও সংস্কৃত শাস্ত্র অনুবাদ করেছিলেন। তিনি আবার আর্য আক্রমণ তত্ত্ব খাড়া করলেন। তাতে দাবি করা হল শাদা চামড়ার আর্যরা পশ্চিম থেকে ভারতে ঢুকে সংস্কৃত ভাষা ও বৈদিক ধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। ফলে ভারতীয়দের মনে আত্মবিশ্বাস ও আত্মসম্মান লোপ পেল।

ব্রিটিশরা উপলব্ধি করেছিল যে, যদি তারা ভারতীয় সভ্যতার দিকে নিরপেক্ষভাবে তাকায়, তবে একে ভূয়সী প্রশংসা না করে পারা যাবে না। কিন্তু যারা সর্বগ্রাসী ক্ষমতার অধিকারী হতে চায় তাদের তো এতে মুস্কিল হবে। একটা বিষয় লক্ষ করেছেন সবাই যে প্রাচীন মিশরীয়, মেসোপটেমিয় ও মায়া সভ্যতার প্রশংসা করতে এদের আটকায় না, কারণ সেগুলোর কোনো অস্তিত্ব নেই। তাদের অস্তিত্ব শুধু জাদুঘরে। ভারতীয় সভ্যতা কিন্তু এখনো জীবন্ত এবং ক্রমঅগ্রসরমান। কাজেই যারা বৈশ্বিক ক্ষমতা দখল করতে চায় তাদের পক্ষে ভারত একটা বাধা। তাই বামেরা

সর্বদা তৎপর থাকে ভারতীয় সভ্যতাকে যতটা সম্ভব খাটো করে দেখাতে।

কিন্তু ভারতকে বিশ্ব আবার শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করেছে। ভারত এখন সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতি। ভারতের বিপুল জনসংখ্যাকে নবতম প্রযুক্তির ছত্রছায়ায় আনা হচ্ছে। ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, ভারতের উচ্চপ্রশিক্ষিত প্রযুক্তিবিদরা বিশ্বের সব বড় বড় প্রযুক্তি কোম্পানির শীর্ষে আরোহন করেছে। অনেকগুলো দেশকে বিনামূল্যে করোনা ভ্যাক্সিন দিয়েছে ভারত মানবতার খাতিরে। এই দেশই একমাত্র পারে চিনের সম্প্রসারণবাদকে প্রতিহত করতে। মার্ক্সবাদীরা যারা বিশ্ব ক্ষমতার দখল নিতে চায় তারা ভারতের নতুন পরিচয়কে মেনে নিতে পারছে না, ভারতের বিরুদ্ধে নাগাড়ে বিষোদ্গার করে চলেছে। কারণ তারা ভারতকে থামাতে পারছে না কিছুতেই। ভারতকে তারা হতোদ্যম করতে চায়। কয়েক শতক আগে ব্রিটিশরা যেমন ভারতের আত্মসম্মানকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, ঠিক তেমনই নব-মার্ক্সবাদীরা তাই করতে চাইছে।

ওক বাস্তুতন্ত্র দৃঢ়প্রতিজ্ঞ—তারা আমেরিকার ক্রিটিকাল রেস তত্ত্বকে ভারতে পুনরুৎপাদন করতে চাইছে। তারা আমেরিকার বর্ণবাদকে (রেসিজম) ভারতের জাতব্যবস্থার সঙ্গে এক করে দেখাতে চাইছে। আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গদের তুলনা করা হচ্ছে যথাক্রমে ভারতের ব্রাহ্মণ/উচ্চ জাতের লোক ও দলিতদের সঙ্গে। কিন্তু রেস বা বর্ণ পরিবর্তন করা যায় না, তা জন্মের সঙ্গে জড়িত। আর জাত বৃত্তি বা পেশার সঙ্গে, গুণকর্মের দ্বারা তা নির্ধারিত হয়। কাস্ট শব্দটাই বিদেশি। এর উৎস আছে স্পেন ও পর্তুগালে; স্পেনকে মুরদের হাত থেকে উদ্ধার করে তারা ইহুদিদের খ্রিস্টধর্মে অন্তরিত করতে লাগল তাদের উপর গণহত্যা চালিয়ে। এই ধর্মান্তরিত ইহুদীরা তাদের উচ্চতর মেধার জোরে রাষ্ট্রে শাসন ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় খুব উচ্চ স্থান অধিকার করেছিল। মূল খ্রিস্টানরা ঈর্ষাকাতর হয়ে নিজেদের 'পুরনো ক্রিস্টান' আর ধর্মান্তরিতদের 'নতুন খ্রিস্টান' বলে অভিহিত করতে লাগল। তাদের ধারণা ছিল তাদেরই রক্ত খাঁটি। এই বিভিন্ন গোষ্ঠিকেই বলত কাস্ট (caste)। তার আগে স্পেন ও পর্তুগালে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের আগে caste কথাটা ব্যবহৃত হত বিভিন্ন ধরণের প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য।

আমেরিকা দখল করে স্পেনীয়রা কাস্ট সিস্টেম চালু করল। তারা ঠিক করল যে নতুন ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের আচার আচরণ খুঁটিয়ে লক্ষ করা হবে। তাদের কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হবে না। যদি নতুন ধর্মান্তরিতরা তাদের পুরনো বিশ্বাসের প্রতি অনুরাগ বজায় রাখত এবং গোপনে তার প্রথা ও আচার পালন করত। তবে তাদের ইনকুইজিশনের নামে অত্যাচার চালানো হত। ভারতেও গোয়ায় এই ধর্মান্তরিত হিন্দুদের উপর ইনকুইজিশন চালিয়েছেন খ্রিস্টান পাদ্রীরা। ইউরোপে বিভিন্ন কাস্টের মধ্যে জলচল বা মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল। ইউরোপের কাস্টের সঙ্গে রেস-এর ভীষণ মিল ছিল। *(ক্রমশঃ)*

পরিষদ বার্তা

বাগনান প্রখণ্ডে সীতা নবমী পালন

আজ পবিত্র সীতা নবমী উপলক্ষে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত মাতৃশক্তি, হাওড়া গ্রামীণ বাগনান প্রখণ্ডের উদ্যোগে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুষ্ঠানটি পালিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়ে পরিবেশ এক আধ্যাত্মিক আবহে ভরে ওঠে। মাতা সীতা ভারতীয় সংস্কৃতিতে ত্যাগ, সহিষ্ণুতা, পবিত্রতা ও আদর্শ নারীত্বের প্রতীক। তাঁর জীবন আমাদের ন্যায়, ধর্ম ও মর্যাদার পথে চলতে শিক্ষা দেয়। সমাজে নারীশক্তির মর্যাদা ও গুরুত্ব প্রতিষ্ঠায় মাতা সীতার আদর্শ আজও প্রাসঙ্গিক। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আদর্শে এই ধরনের আয়োজন সমাজে সাংস্কৃতিক চেতনা, নৈতিক মূল্যবোধ এবং ঐক্যের বার্তা বহন করে। মাতা সীতার জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে আমরা সবাই একটি সুসংগঠিত ও মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ গঠনের সংকল্প গ্রহণ করি। জয় সীতা রাম।

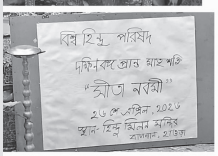

पुनर्जाग्रत बंगाल : नेताजी की राष्ट्रभक्ति और सनातन की दिशा में नया अध्याय

प्रशांत सिंघानिया

पिछले 5 दशकों में पश्चिम बंगाल ने शासन और सांस्कृतिक दिशा दोनों में पतन की अवधि देखी। कभी भारत के अग्रणी राज्यों में से एक, बंगाल आजादी के बाद क्रमशः दूसरे स्थान से नीचे गिरकर 25वें स्थान तक आ गया—शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और राष्ट्रीय चतेना में यह गिरावट स्पष्ट रही। आर्थिक कमजोरी, सामाजिक असमानता और राजनीतिक अस्थिरता ने राज्य को विकास और आत्मसम्मान दोनों से दूर कर दिया।

लेकिन 2026 का चुनाव एक नया मोड़ लेकर आया। एक राष्ट्रीयतावादी भाजपा सरकार का गठन केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं है; यह नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्श और उनकी राष्ट्रभक्ति की पुनःजागृति का प्रतीक है। नेताजी, जिन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना से लेकर अज़ीम रणनीतियों तक, हर निर्णय में धर्म, कर्म और राष्ट्रभक्ति को एकसूत्र में पिरोया, आज भी बंगाल के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बने हुए हैं।

नेताजी का दृष्टिकोण : राष्ट्र, धर्म और कर्म

नेताजी हमेशा मानते थे कि सच्ची राष्ट्रीय शक्ति केवल राजनीतिक आकांक्षओं में नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, कर्मयोग और धर्म की स्थिरता में निहित है। उनके विचारों में गहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण था, जो मानव चेतना के

गहन स्तर से जुड़ा था। उनका गुमनामी का जीवन उत्तर प्रदेश में केवल व्यक्तिगत तपस्या नहीं, बल्कि यह संकेत था कि महान आत्माएँ तभी कार्य कर सकती हैं जब समाज और राष्ट्र उनके प्रति शुद्ध और सामूहिक पुकार करें।

''केवल एक सच्चा जीवन वही है जिसने दूसरों के लिए त्याग करना सीखा है, जिसने अपने लाभ को त्याग कर राष्ट्र और समाज की सेवा को अपनाया है।''

यह संदेश आज भी बंगाल के लिए प्रासंगिक है। राजनीतिक और सामाजिक पुनर्निर्माण तभी सार्थक होगा जब यह व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना के साथ जुड़ा हो।

मोदी जी और गृह मंत्री का मार्गदर्शन : राष्ट्रीय चेतना का सशक्त सूत्र

मोदी जी और गृह मंत्री का मार्गदर्शन इस परिवर्तन में निर्णायक भूमिका निभा रहा है। नेताजी की फाइलों का सार्वजनिककरण, 23 जनवरी को 'पराक्रम दिवस' के रूप में घोषित करना, अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन, और इंडिया गेट पर नेताजी की 28 फूट ऊँची प्रतिमा स्थापित करना—ये केवल स्मृति के प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्रभक्ति की वर्तमान प्रेरणा हैं।

गृह मंत्री की रणनीतिक भूमिका, विशेषकर पश्चिम बंगाल में, सुनिश्चित करती है कि यह परिवर्तन केवल चुनावी जीत तक सीमित न रहे, बल्कि राज्य में वास्तविक प्रशासनिक और सामाजिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त करे। यह वही सूक्ष्म दृष्टि है जो हमेशा महान नेताओं और साधकों के पीछे कार्य करती रही—गोपनीय, स्थिर, और परिणाममुखी।

सनातन, योग और ज्ञानगंज का विज्ञान

नेताजी और उनके अनुयायियों का दृष्टिकोण केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वौज्ञानिक भी था। सनातन धर्म और कर्मयोग के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध किया कि समाज और राष्ट्र की स्थिरता केवल बाहरी सुधारों से नहीं, बल्कि आंतरिक चेतना, योग और धर्मात्मा नेतृत्व से आती है।

ज्ञानगंज और आकाशीय योजनाएँ भी इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। महान योगी और तत्वज्ञ अपने सशकत विचारों और साधनाओं के माध्यम से ब्रह्मांडीय आदेशों को समझते हैं और इसे जीवित दुनिया में अपने विश्वस्त अनुयायिओं के माध्यम से कार्यान्वित करते हैं। यही दृष्टि मोदी जी के दृष्टिकोण में भी परिलक्षित होती है—न केवल राजनीतिक सुधार, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जागृति के लिए एक स्थिर और नियंत्रित मार्ग।

''जहाँ पात्र शुद्ध होता है, वहाँ अमृत स्वयं प्रवाहित होता है।''

यह सूत्र बंगाल के लिए भी प्रासंगिक है। जब राज्य की नई सरकार कार्यशील, धर्मात्मा और राष्ट्रीय चेतना से प्रेरित होगी, तभी नेताजी के आदर्श जीवंत होंगे।

चुनौतियाँ और अवसर

बंगाल की चुनौतियाँ स्पष्ट हैं—अर्थव्यवस्था की गति, सामाजिक सुधार, शिक्षा और स्वास्थ्य, और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण लेकिन अवसर भी उतने ही विशाल हैं। यदि राज्य नेतृत्व राष्ट्र और सनातन के सिद्धांतों से प्रेरित होकर कार्य करे, तो बंगाल केवल भारत का अग्रणी राज्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पुनर्जागृति का केंद्र बन सकता है।

नेताजी का जीवन हमें यह सिखाता है कि महान परिवर्तन केवल रणनीति या राजनीति से नहीं आता। यह शुद्ध, सामूहिक और निरंतर पुकार और त्याग से आता है। बंगाल में यह पुकार अब राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व के माध्यम से संगठित रूप ले रही है।

निष्कर्षः पुनर्जाग्रत बंगाल, पुनर्जाग्रत राष्ट्र

2026 का चुनाव बंगाल के लिए केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और राष्ट्रीय चेतना का पुनःजागरण है। नेताजी का आदर्श/गुमनामी बाबा का तप, सनातन की स्थिरता, और मोदी जी एवं गृह मंत्री का मार्गदर्शन—ये सभी एक सूत्र में बंधकर राज्य को नया जीवन देने का संकेत देते हैं। यदि बंगाल इस अवसर को आत्मसात कर सके, तो यह न केवल नेताजी के सपनों का पुनर्जागरण होगा, बल्कि संपूर्ण भारत की राष्ट्रीय चेतना, सांस्कृतिक स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति का सशक्त प्रतिबिंब बनेगा। ■

जय हिन्द।

श्रीरामजी को प्रिय लगनेवाले श्रेष्ठ नौ नवक

अरुण चूड़ीवाल

2 मई 2026 से ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो गया है। लगभग 2.7 वर्ष अर्थात् 32.4 महीने के पश्चात् अधिक मास आता है। इस वर्ष अर्थात् विक्रम संवत 2084 में ज्येष्ठ माह में अधिक मास है जिसके अवधि 17 मई 2026 से प्रारंभ होकर 15 जुन 2026 तक है।

अधिक मास प्रत्येक तृतीय वर्ष में मूलतः सौर्य वर्ष एवं चंद्र वर्ष के 10 दिन के अंतराल की सामंजस्य को स्थापित करने के लिए ज्योतिष गणना के अनुसार रखा जाता है। सनातन परंपरा में इस अधिक मास को पुरुषोत्तम माह कहा गया है।

पुरुषोत्तम माह में भगवान विष्णु एवं उनके अवतारों की पूजा अर्चना का विशेष आयोजन किए जाते हैं। श्रीराम कथा एवं श्रीकृष्ण कथा आदि का माह पर्यंत आयोजन होता है। रामचरितमानस में नवधा भक्ति का उल्लेख है। इसी प्रकार एक अन्य राम कथा ग्रंथ है—आनंद रामायण। आनंद रामायण में भगवान श्रीराम के अर्चना में प्रस्तुत नौ विधियों एवं प्रत्येक विधि में प्रस्तुत नौ सामग्रियों की विस्तृत सूची दी गई है। आनंद रामायण के अनुसार भगवान श्रीराम को प्रिय नौ नवक निम्नलिखित है।

1. पुष्प (नवक)

1. जाती → चमेली 2. चम्पक 3. मंदार 4. तुलसी 5. मुनि/अगस्त्यपुष्प 6. मालती 7. दमन एक सुगंधित पौधा 8. केतकी केतकी/केवड़ा 9. सिंही नागकेसर।

2. नैवेद्य (नवक)

1. मोदक 2. लड्डू 3. मंड → मांड़ 4. वटक → वड़ा 5. फेणिका → फेनी 6. वरान्न → सादा दाल भात 7. ओदन → पका हुआ चावल (भात) 8. शाक → साग 9. पायस → खीर।

3. फल (नवक)

1. आम 2. जम्बू 3. कपित्थ → कैथ 4. बीजपूर → बिजौरा नींबू 5. दाडिम → अनार 6. खजूर 7. नारियल 8. केला 9. कटहल।

4. ताम्बूलसामग्री (नवक)

1. पान का पत्ता 2. सुपारी 3. कत्था 4. चूना 5. जायपत्र 6. लौंग 7. जायफल 8. वरांगक (कपूर) 9. इलायची।

5. राजोपचार (नवक)

1. छत्र → राजछत्र 2. सिंहासन 3. यान (रथ, पालकी) 4. चामर → यक्ष-पूंछ से बना पंखा 5. व्यजन → पंखा 6. पानपात्र 7. ताम्बूलदान 8. उगलदान → पीकदान 9. वस्त्रपेटिका → वस्त्र रखने का संदूक।

6. भोग्यपदार्थ (नवक)

1. चन्दन 2. पुष्पमाला 3. इत्र 4. विविध फल 5. अवतंस → कान में पहनने योग्य पुष्प या आभूषण 6. सुगन्धित उत्तम बेल 7. ताम्बूल—पान (पूजन के बाद अर्पित) 8. कस्तूरी 9. लाल अक्षत।

7. शय्यासामग्री (नवक)

1. पर्यक 2. तूलिका → गद्दा 3. वितान → पर्दा (बिस्तर के ऊपर लगाने वाला) 4. उपबर्हण → तकिया 5. दर्पण 6. दीपक 7. प्रावरण → ओढ़ने का कपड़ा 8. व्यजन → पंखा।

8. वस्त्र (नवक)

1. पीताम्बर → पीले रंग का मुख्य वस्त्र 2. उत्तरीय वस्त्र → अंगवस्त्र 3. पगड़ी → मुकुट के समान सम्मान 4. कंचुकी → शरीर के ऊपरी भाग का वस्त्र (अंगरखा) 5. पगड़ी के ऊपर का वस्त्र 6. कटिबन्ध वस्त्र → करधनी या पट्टा 7. मुख पोंछने के लिये वस्त्र → रुमाल 8. गोद में रखने के लिये तिकोना वस्त्र 9. दुपट्टा।

9. दिव्य अलंकार (नवक)

1. कुण्डल (दो) 2. कंकण (दो) 3. माला 4. केयूर (दो) → बाजू में पहनने वाले बाजूबंद 5. नूपुर (दो) 6. पदक—लॉकेट 7. कटिसूत्र → कमर में पहनने का आभूषण 8. श्रृंखला → हार 9. मुद्रिका → अंगूठी।

ज्येष्ठ पुरुषोत्तम माह में श्रीराम अर्चना में उपयुक्त सामग्री उपयोग में ली जा सकती है। ■

ভুল সংশোধন

গত এপ্রিল সংখ্যায় রাজকুমারী মাহেশ্বরীর লেখায় 'পারস্যের সম্রাট' লেখা হয়েছিল। সেটা হবে 'ম্যাসোডোনিয়া সম্রাট'।

"মহৎ ভাবনাই মহৎ কর্মের জন্ম দেয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সীতা নবমী, রানাঘাট, মধ্যবঙ্গ

সীতা নবমী, জগদ্দল, দক্ষিণবঙ্গ

সীতা নবমী, মাদপুর প্রখণ্ড, মেদিনীপুর জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

সীতা নবমী, ঘাটাল প্রখণ্ড, মেদিনীপুর জেলা, দক্ষিণবঙ্গ

সীতা নবমী, কাঁথি, দক্ষিণবঙ্গ

সীতা নবমী, শিলিগুড়ি, উত্তরবঙ্গ

VISHVA HINDU VARTA
Phone : 2555-3589

15th May, 2026
Price : Rs. 15 only

RNI NO. : 30136

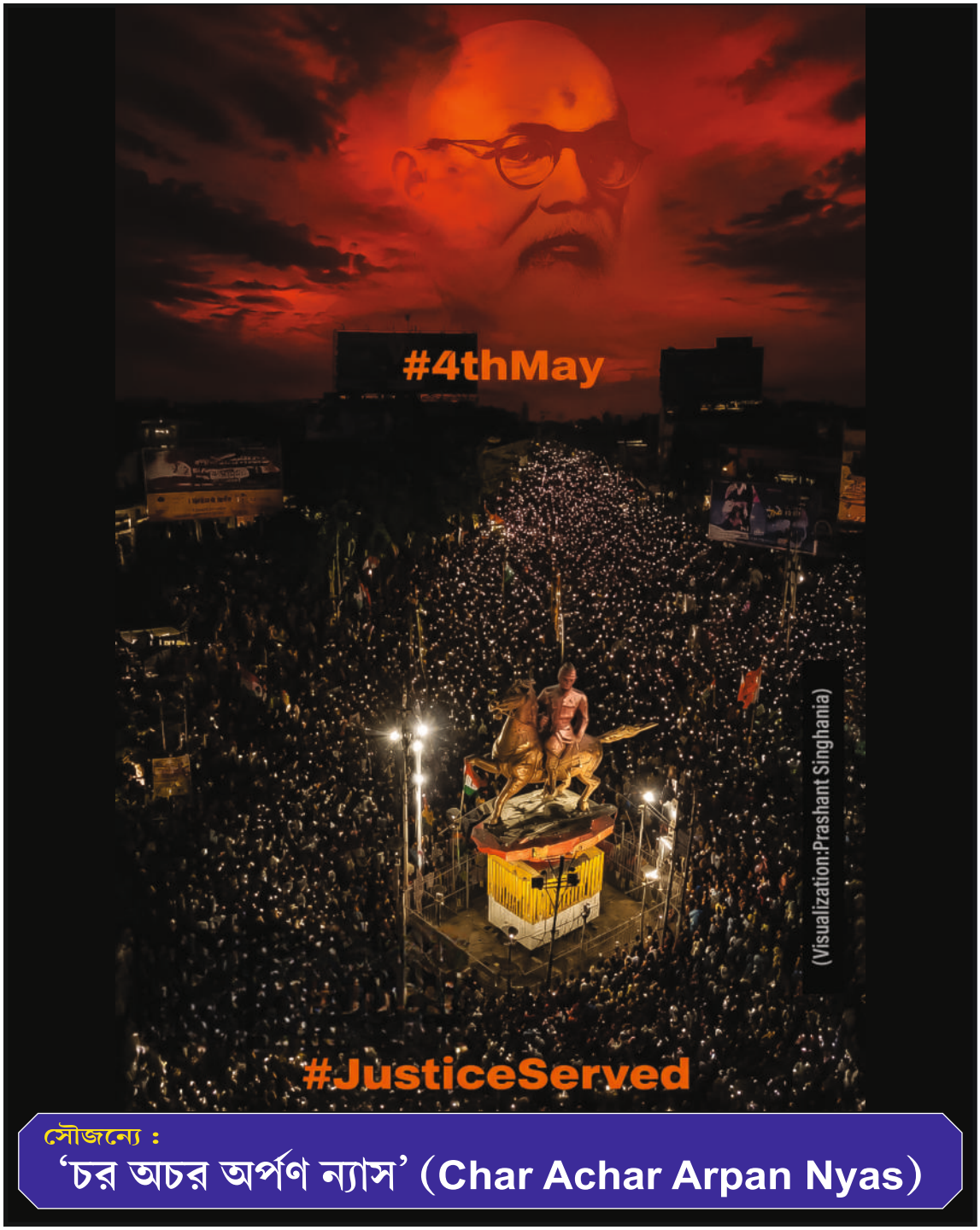

সৌজন্যে :
‘চর অচর অর্পণ ন্যাস’ (Char Achar Arpan Nyas)

Publisher : VISHVA HINDU PARISHAD, Dakshin Banga
33, Bhupen Bose Avenue, P.S.-Shyampukur, Kolkata-700004
Printed at Aditya Graphics & Printing, B/15/1/H/2, Balai Singha Lane, P.S.-Amherst Street, Kolkata-700009
E-mail : vishvahindu1964@gmail.com, vishvahinduvarta@yahoo.in